বিষবৃক্ষ।

উপন্যাস।

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।

বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮০।

কাব্যপ্রিয়

পণ্ডিতাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায়

সুহৃদ্বরকে

বন্ধুত্ব এবং স্নেহের চিহ্ন স্বরূপ

এই গ্রন্থ

অর্পিত হইল।

বিষবৃক্ষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নগেন্দ্রের নৌকা যাত্রা।

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন; নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক মোকদ্দমা মামলার তদ্বির করিতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ মহা ধনবান্ ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার উল্লেখ করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষ মাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজ্‌রায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে২ গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—নাচিতেছে—হাসিতেছে—ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ তামাকু খাইতেছে, কেহ বা

মারামারি করিতেছে, কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। মাঠে মাঠে কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর লইয়া কৃষকের মহিষীরা, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈছে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ, লইয়া বাজার বসাইতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাতায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন,—মধ্যমবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজার ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্ন মুদিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইয়া পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভাল মানুষের মত আপন মনে গঙ্গার স্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আগ্রীব নিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যেতে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে সাদা মেঘ রৌদ্র তপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেলগাছে চীল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারি দিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে,—

আপনার প্রয়োজনে। ক্ষেয়া নৌকা গজেন্দ্র গমনে যাইতেছে, —পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কাল হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। রহমত আর কখন মাঝিগিরি করে নাই—তাহার নানার ফুফু মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্ব্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকে ডাকে খাটো নন্, নেমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল "ভয় কি হুজুর। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকুন্।" রহমত মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতিনিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয় রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল। তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমত মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল, আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। মাল্লারা পাল

মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সাসী ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকাসজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে, নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন 'তাহাতেই বা ক্ষতি কি?' ক্ষতি কি আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে "হজুর? পুরাতন কাছি কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়ে, নদীতীরে ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহার সাধ্য নহে। বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্ত্তী, নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল, ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘ-পরিপূর্ণ; সুতরাং রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

আকাশের মেঘাড়ম্বর কারণ, রাত্রি প্রদোষ কালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবলমাত্র, বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা-পরিমণ্ডিত হইয়া হীরক-খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেত-কৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নববারি-সমাগম-প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল, ঝিল্লীরব মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায়

অশ্রান্তরব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুর পতন শব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চার শব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধূননশব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতন শব্দ। ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুত-বারি কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি-বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু কষ্টে আলোক সন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন এক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দীপ নির্ব্বাণ।

গৃহটী নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সমাগমচিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক, ও নানাবিধ কীট পতঙ্গাদি সমাকীর্ণ। একটীমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কক্ষ-

মধ্যে মনুষ্য-জীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রীই দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিন চারি খানি তৈজস—ইহাই কক্ষালঙ্কার। দেওয়ালে কালি, কোণে ঝুল; চারি দিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিক্‌টিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় এক জন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত। শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টক খণ্ডের উপর একটী মৃণ্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থিত নরদেহেও তাই। আর শয্যাপার্শ্বে আরও এক প্রদীপ ছিল,—এক অনিন্দিত-গৌরকান্তি স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়-রূপিণী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুই জন আশুভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রের প্রবেশ কালে, কেহই তাঁহাকে দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা এই বহু-লোক-পূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। এক দিন ইহাদিগের সম্পদ ছিল, লোকজন দাস দাসী সহায় সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্য-সমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্র কন্যার মুখমণ্ডল, হিমানী-সিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকত শয্যায় শয়ন করিলেন। আর সকল তারাগুলিনও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা, সেও পিতৃ সমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই লোক

মনোমহিনী বালিকা সেই বিজন বনবেষ্টিত ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের এক মাত্র উপায়। কুন্দ-নন্দিনী, বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসার বন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছু দিন যাক্, কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এই রূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়িবে সে দিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন? আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

এই গভীর, অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতিনিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদিতোন্মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখ প্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখ প্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্য-স্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজঃ হইল, ব্যথিত প্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী, পিতার মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারা; বাহিরে এক্ষণও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষ-পত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জ্জন করিতে-ছিল, ভগ্ন গৃহের কপাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শব মুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে

অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গৃহ দ্বার হইতে অপসৃত হইলেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছায়া পূর্ব্বগামিনী।

নিশীথ সময়। ভগ্ন গৃহ মধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাঁহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা"। কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ এক বার মনে করিল পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মনে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজন হস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়া ছিল, সেই স্থানে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেননা মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে? দিবা রাত্র জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী রাত্রি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিতেছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্ত হস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশ মণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয়

ভাস্বর, অথচ নয়ন-স্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে চন্দ্র নাই; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডল-মধ্য-বর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি-সনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতে ছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মি চ্ছুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডল-মধ্যশোভিনী, আলোকময় কিরীট-কুণ্ডলাদি ভূষণালঙ্কৃতা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতি। রমণীয় কারুণ্য পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলে, স্নেহ পরিপূর্ণ হাস্যে অধর স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে, সানন্দে চিনিল, যে সেই করুণাময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহু কাল পরে "মা" কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে, জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যস্থা কুন্দের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইতেছিস্। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুমকোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস্ না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যেন ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত নক্ষত্র-লোক দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, যে "ঐ দেশে।" কুন্দ তখন যেন বহু দূরবর্ত্তী, বেলাবিহীন অনন্তসাগরপারস্থবৎ, অপরিজ্ঞাত নক্ষত্র লোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অত দূর যাইতে পারিব না; আমার বল নাই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদ-জনিতবৎ ভ্রূকুটী বিকাশ

হইল, এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্র-লোক প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর এক বার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার আসিয়া দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে, আকাশ প্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে সে পথে যাইও না।"

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলি সঙ্কেতের দ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্তললাট; সরল, সকরুণ, কটাক্ষ; তাহার মরালবৎ দীর্ঘ, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা, এবং অন্যান্য মহাপুরুষ লক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইঁহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে২ সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে জননী কুন্দকে কহিলেন; "ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধর বোধে ইঁহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "ঐ দেখ" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কুন্দ দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষ মূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, পদ্মপলাশ-নয়নী, যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও

কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, “এই শ্যামাঙ্গিনী নারী বেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।”

ইহা বলিতে২ সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল, এবং তৎসহিত তন্মধ্যসম্বর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সেই।

নগেন্দ্র গ্রাম মধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং অর্থানুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ২ আসিয়া মৃতের সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। এক জন প্রতিবাসিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল। কুন্দ যখন দেখিল যে, তাহার পিতাকে সৎকারের জন্য লইয়া গেল, তখন তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবিরত রোদন করিতে লাগিল

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্য্যে গেল। কুন্দনন্দিনীর সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহার সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে২ প্রত্যাশাপন্নাবৎ আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতূহল প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, “এক শ বার আকাশ পানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?”

কুন্দ তখন কহিল, “আকাশ থেকে কাল্ মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, ‘আমার সঙ্গে আয়।’ আমার কেমন

দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি ভয় পাইলাম, মার সঙ্গে গেলেম না। এখন ভাবিতেছি কেন গেলেম না। এখন আর যদি তিনি আসেন তবে আমি যাই। তাই ঘনং আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতেছি।"

চাঁপা কহিল, "হাঁ! মরা মানুষ নাকি আবার আসিয়া থাকে!"

তখন কুন্দ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়ে মানুষ দেখিযাছিলে, তাহাদের চেন?"

কুন্দ। "না, তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখন দেখি নাই।"

এ দিগে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃত ব্যক্তির কন্যার কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই। তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর। উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যত দিন সে তোমাদিগের বাড়িতে থাকিবে, তত দিন আমি তাহার ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।"

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া এক জন বলিল, "শ্যাম-বাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেই খানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থ কন্যার উপায় হয় এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।"

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। এবং কুন্দকে এই কথা বলিবার জন্য, তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

আসিতে২ দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া, কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চাঁপা কহিল, "ও কি দাঁড়ালি যে?"

কুন্দ অঙ্গুলি নির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "এই সেই।"

চাঁপা কহিল, "এই কে?" কুন্দ কহিল, "যাহাকে মা কাল্ রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। বালিকা-দিগকে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিতা দেখিয়া নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনেক প্রকারের কথা।

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আত্মসমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার মাতৃস্বস্বপতির অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল--সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশ বাবু প্লণ্ডর ফেয়ার্লির বাড়ীর মুতসুদ্দি। হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেই খানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্য গৌরবের সঙ্গে২ বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা, মিস্ টেম্পল্ নাম্নী এক জন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত রাখিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

কমল বড় দুষ্ট। নগেন্দ্র এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেই কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়িল। একটা টবে কতকটা অনতি তপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার ভিতরে ফেলিল। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতে২ স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। এক জন পরিচারিকা স্বয়ং কমলকে এই রূপ কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিয়া, তাড়াতাড়ি "আমি দিতেছি। আমি দিতেছি," বলিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল—কমল সেই তপ্ত জল ছিটাইয়া পরিচারিকার গায়ে দিল, পরিচারিকা পলাইল।

কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত এবং স্নাত করাইলে—কুন্দ শিশির-ধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল, তাহাকে অমল শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার কেশ রচনা করিয়া দিল ; এবং কতক গুলিন অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া, বলিল, "যা, এখন দাদা বাবুকে প্রণাম করিয়া আয়। আর দেখিস্—যেন এ বাড়ির বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না —এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"

নগেন্দ্রনাথ, কুন্দের সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃৎ দূর দেশে বাস করিতেন—নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর উল্লেখ করিলেন,—যথা,—

"বল দেখি কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে চল্লিশ পরে, কেন না তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে, কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যে এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই

যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বুঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখা পড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখা পড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি। কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না! বলিলে, বৃহৎ, নীল দুইটী চক্ষু—চক্ষু দুইটী শরতের পদ্মের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটী চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে২ অন্য-মনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতি-স্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুটী চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটী যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয় যেন এ পৃথিবীর সে চোখ্ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অ-প্রশংশনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখন দেখি নাই। বোধ হয় যেন, কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটী, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন শান্তভাব ব্যক্তি—যদি স্বচ্ছ সরো-

বরে শরচ্চন্দ্রের কিরণ সম্পাতে যে ভাব-ব্যক্তি তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এই রূপ ;—

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

একটী বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিসের কাঁচারই আদর। কাঁচা পেয়ারা, কাঁচা সসা, লোকে ভাল বাসে, নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচা-মিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?

তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্বত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পুরা অধিকার। কমল যদি আমায় বেদখল করে, আমি বড় দুঃখিত হইব না।

মেয়েটিতে আমার কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটী ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি তাত জান। যদি একটী ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আনিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া

আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর২ উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় নাকি ছয় মাস থাকিলে মানুষ ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় না করিয়া থাক, তবে সঙ্গে লইয়া আসিও, তুমি আসিলেই বিবাহ দিব। যদি নিজে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক তবে বল, আমি বরণ ডালা সাজাইতে বসি।”

তারাচরণ কে তাহা পরে প্রকাশ করিব। কিন্তু সে যেই হউক, সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সকলে আহ্লাদ পূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন। কিন্তু মনুষ্য ত চিরান্ধ! কয়েক বৎসর পরে এমত এক দিন আইল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কু ক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম? কি কু ক্ষণে সূর্য্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।

এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজ্‌রা সাজাইয়া, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রা কালে এক বার তাহা স্মরণ পথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ

কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ২ এমন পতঙ্গ-বৃত্ত যে, জলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তারাচরণ।

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কবি কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না—তৎ পরিবর্ত্তে স্বরচিত কাব্য গুলিন মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন মালিনীর পুকুরে একটী অপূর্ব্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কার স্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর, কিন্তু সকলেই জানেন, যে তাহার প্রথম কবিতা কয়টী কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনি সখি! চলিলে যে?"

মালিনী বলিল, "তোমার কবিতায় রস কই?"

কবি। "মালিনি! তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।"

মালিনী। "কেন?"

কবি। "স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষ যোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূত কাব্য স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে—এই নীরস কবিতা গুলিন সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিলে না—তবে লক্ষ যোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে?"

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীতা হইয়া, আদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পর দিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্র মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবি শিরে পরাইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষ যোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণী মধ্যে কেহ মালিনী-চরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই, যে তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে, সে রসমধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন না।

সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা এক জন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতার কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থ কন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালন পালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্য্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্য্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন

করিলেন, এবং তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীন বৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, লেখা পড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে ইংরাজি শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টর নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে, গ্রাণ্ট্ ইন্ এডের প্রভাবে, গ্রামে২ তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ, নিরীহ ভাল মানুষ মাষ্টর বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টর বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ এক জন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি Citizen of the World এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে, তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর!" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ২ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন "তোমরা ইঁট পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জেটাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও তাহাদের পিঁজরায়

পূরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।” স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটা বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোক শূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সূর্য্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায়, কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কাল কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কিপ্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের সুরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কুন্দ, নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আইল। কুন্দ, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক হইল, এতবড় বাড়ী সে কখন দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটী মহল এক একটী বৃহৎ পুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুঃপার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূন্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে, গোগণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে২ মণ্ডলাকারে রোপিত,

সকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে, বড় উচ্চ দেড় তালা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেণ্ডায়, বড়২ মোটা ফ্লুটেড থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃণ্ময় বিশাল সিংহ, জটাবিলম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি এক তালা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোসাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারি বাড়ী।" উহার পাশে "পূজার বাড়ী।" পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্তর। মধ্যে বড় উঠান। এমহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধুমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দর দালান পায়রায় পূরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারি সকল আসবাবে ভরা—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির; সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাটমন্দির," তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারিদিগের থাকিবার ঘর, এক অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারির দল, পাচকের দল, কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাস দাসীরা, কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে।

অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও, ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ীর দাসী মহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছে। কোথাও শ্বেত শ্মশ্রুবিশিষ্ট, গৈরিক বসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষ মালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও, কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি-ময়দার পরিমাণ লইয়া, গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও, বৈরাগীর দল শুষ্ককণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাতায় আর্কফলা নাড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না,—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও, বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রস-কলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে "মধো কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গাইতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গাইতেছে, কোথাও অর্দ্ধ বয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাট মন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতা পিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে।

এই তিনটি, তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত; ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র

এবং অপরিষ্কার। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয় কুটুম্বকন্যা, মাসী মাসীত ভগিনী, পিসী পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বট বৃক্ষের ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ী, বালিকার রোদন, "জল আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁধলে না," "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে, ঠাকুর বাড়ীর পশ্চাতে, রন্ধন শালা। সে খানে আরো ঝাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জালদিয়া, পা গোটো করিয়া, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে তাহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে২ ধুঁয়ায় বিগলিত-লোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেননা তপ্ত তৈল ছিট্‌কাইয়া তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। কেহ বা স্নানকালে বহু তৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাশি, চূড়ার আকারে সীমন্ত দেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন শ্রীকৃষ্ণ, পাচনী হস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছেন। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে; হাতে ঘস্২, কচ২ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদির স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি

হইয়াছে, সে দারোগার মুহুরি, গোপালে উড়ের যাত্রার মত, পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গলায় নাই, ইংরাজেরা নাকি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন, ভট্টাচার্য্যদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস, এই রূপ নানা বিষয়ের সমালোচন হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গনে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্য প্রাণ সংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, ন্যায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে, যে যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোন রূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেক গুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, সকুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহারা অবকাশ মতে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করত বিনা অনুমতি-তেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকার প্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃত বোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দর মহলের পরে, পুষ্পোদ্যান। পুষ্পো-দ্যান পরে, নীলমেঘ খণ্ড তুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিন মহল, ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই

খিড়কী। ঐ পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে; আস্তাবল, হাতিখানা, কুকুরের ঘর, গো-শালা, চিড়িয়াখানা, ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনন্দিনী, বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে২ শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সূর্য্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্র সঙ্গে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে২ এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল, যে তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন, কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী, পূর্ণচন্দ্র তুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণিনী। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু যে প্রকৃতির চক্ষু কুন্দ স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিম পল্লব-রেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণ তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎস্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর, এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীর অবয়ব ও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি। সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত মাধবীলতার ন্যায় সৌন্দর্য্যভরে দুলিতেছে। স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি সুন্দরী, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাঁহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই,—সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়্‌বিংশতি। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, কুন্দ সচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যার্থ

দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে প্রধান, তাহাকে কহিলেন, "যে এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, কুন্দের শরীর কণ্টকিত, এবং আপাদ মস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্ত্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী।

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদু নিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে গা?"

দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ।

এই খানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রথা আছে, যে বিবাহটা শেষে হয়, আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে, যে নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্ব্বগুণে ভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢলু২ করিবে। গরিব তারাচরণেরত এ সকল কিছুই নাই—সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আর খাঁদা নাক—বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলে মহলে প্রকাশ—আর প্রণয়ের বিষয়টা

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কতদূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু২ ছিল।

সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে, তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া, তিনি এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে, যে তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধ সকল প্রায় দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠক খানাতেই পড়া হইত। তৎ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক কালে মাষ্টর সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিত যে, "কখন যদি আমার সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে আমার স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল—কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচার হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কই হে তুমি ও কি ওল্ড ফুলেদের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদিগের আলাপ করিয়া দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয়, পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। এই মত টালমাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, কুন্দকে বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী মেরামত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র এক দিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আ-

নিয়া, দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিলেন? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নবযৌবন সঞ্চারের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে, দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটী বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া, নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিলেন। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া, কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, সূর্য্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভৎর্সনা করিলেন, যে সেই পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসরকাল কাটিল। তাহার পর—কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন! জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এতদূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এতদূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাসী বৈষ্ণবী।

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছু দিন কালাতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা, সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাঁহারা অনেকগুলি, সকলে স্ব২ মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে, অনতীত বাল্যা কুমারী হইতে পলিত-কেশাবর্ষীয়সী পর্য্যন্ত, সকলেই ছিলেন। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং "উঁ উঁ" করিয়া উকুন মারিতেছিল। কেহ পাকা চুল তোলাইতেছিল, কেহ ধান্য হস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্য পান করাইতে ছিলেন। কোন সুন্দরী, চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন; ছেলে মুখব্যাদান করিয়া কোমল তীব্র উভয়বিধ স্বরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কারপেট বুনিতেছিলেন, কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়ীতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদগ্রন্থরস-গ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাস্থরায়ের পাঁচালি পড়িতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রী বর্গের কর্ণপরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রস কৌশলের বিবরণ সখিদিগের কানে২ বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসিদিগের নিন্দা, করিতেছিলেন; অনেকেই

আত্মপ্রশংসা করিতেছিল। যিনি সূর্য্যমুখীকর্ত্তৃক প্রাতে নিজ-বুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভৎর্সিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতে-ছিলেন; যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপ-নার পাকনৈপুণ্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্ন-গর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিতা; এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেই খানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত। ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এই জন্য অন্তঃপুর মধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া এক জন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ির ভিতর? ঠাকুর বাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতে২ সে মুখ ফিরাইয়া

বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ওমা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো?"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল, যে বৈষ্ণবী যুবতী; তাহার শরীরে তাহার রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত-রমণী মণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে, তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবৎ ভ্রূযুক্ত নিটোল ললাট, বাহু যুগের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণীকুলদুর্ল্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের সদ্বিচারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন, ফেরন, এসকলও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় পেটে পাড়া, পরণে কালা-পেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিতলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকু-রাণীরা গান শুন্‌বে?"

তখন "শুন্‌বো গো শুন্‌বো!" এই ধ্বনি চারিদিকে আবাল-বৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যে-খানে বসিল, সেই খানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া, সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজি বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন। কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপালে উড়ে।" যিনি দাশরথির পাঁচালি পড়িতেছিলেন তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই এক জন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসম্বাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন "গোষ্ঠ"—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গায়িতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে, দাস্‌নে দূতী।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিযা কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হাঁ গা।—তুমি কিছু ফরমাশ করিলেনা?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কানে২ কহিল, "কীর্ত্তন গায়িতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল "ওগো কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো?" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদুং যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠ মধ্যে অতি মৃদুং নববসন্তপ্রেরিতা একা ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ স্বরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত

শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল এবং তৎ সঙ্গে, শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠগীতি-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিত-চিত্তে শুনিল যে সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরি-পূর্ণ করিয়া আকাশ মার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পারিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে এই সর্ব্বাঙ্গীনতাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান, কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত, এবং অল্পবয়সে তাহায় পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোল-নেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখ্‌বো বলে হে,—
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভোরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।
যখন রাধে বোলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়ন জলে, আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনা তীরে,

ভাঙ্গব বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকায়িনু পদতলে,
এখন চরণ নূপুর বেঁধেগলে,
পশিব যমুনা জলে॥

গীত সমাপ্ত হইলে, বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখ চাহিয়া বলিল, "গান গাইয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমা-দিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া, আমার হাতে তুলিয়া দাও আমি জাত বৈষ্ণব নহি।"

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পূর্ব্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণবী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া, কুন্দ তাহার পশ্চাৎ২ জল ফেলিবার যে স্থান, সেই খানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু২ কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া, কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল, বৈষ্ণবী হাত মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রাব্যস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু২, বলিতে লাগিল,

"তুমি নাকি গা কুন্দ?"

কুন্দ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

বৈ। "তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ"?

কু। "না।" কুন্দ শুনিয়াছিল যে তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিণী হইয়াছিল।

বৈ। "তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি

আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদ্‌তেছেন—আহা! হাজার হোক শ্বাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবেনা—তা তুমি এক্‌বার কেন আমার সঙ্গে গিয়া তাকে দেখা দিয়ে এস না?"

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃ২ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শ্বাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শ্বাশুড়ী দেশ ছাড়া হইয়া পলাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল,

"আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাঁদা কাটা করিও, নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাও স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখ প্রক্ষালণ সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে সেই খানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্প বয়স্কারা সকলেই একট২ কাজ লইয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিল, "ও এক জন বৈষ্ণবী গান গায়িতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসী! একটি ঠাকুরাণ বিষয় গা।"

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গায়িলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কার পূর্ব্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় হইল। সূর্য্যমুখীর চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু২ খেম্‌টা বাজাইয়া মৃদু২ গায়িতে২ গেল,

"আয় রে চাঁদের কোণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পর্‌তে দিব সোণা।
আতর দিব সিসি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা কোরে,
আর আপনি সেজে বাটা ভরে, দিব পানের দোনা।"

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে২ একটু২ খুঁত বাহির হইতে লাগিল। বিরাজ বলিল, "তা, হোক সুন্দর, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।" তখন বামা বলিল, "রঙ্গ টা বাপু বড় ফেকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল "চুল গুলো যেন শোনের দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল, "কপাল টা একটু উচু"—কমলা বলিল, ঠোঁট দুখানা পুরু" হারাণী বলিল, "গড়ন টা বড় কাট কাট।" প্রমদা বলিল "মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখিদের মত; দেখে ঘৃণা করে।" এই রূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয়া কুৎ-

সিতা বলিয়া প্রতিপন্না হইল। তখন ললিতা বলিল, "তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।" তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, "তাই বা কি, মাগীর গলা মোটা।" মুক্তকেশী বলিল "ঠিক বলেছ—মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল, "মাগী গান জানে না, একটাও দাসুরায়ের গান গাইতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগীর তাল বোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যারপর নাই কুৎসিত এমত নহে—তাহার গানও যারপর নাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাবু।

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহ রেইল পরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠক খানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। এবং বৈঠক খানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত কবরী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল,; সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষঃহইতে স্তনযুগল খসিল—সে বস্ত্রনির্ম্মিত। বৈষ্ণবী পিতলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানান্তর, বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবা পুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং

গঠন কিশোর বয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবা পুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশ সম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছিল। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায়, দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহার তালুক সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিত শ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা, ক্ষুন্নধনগৌরব পুনর্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার, হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে ঐ হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখা পড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোন সুখেরই আশা নাই। বয়স গুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়স গুণে দম্পতী প্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা

দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিলেন, যে হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায়, গৃহে তিষ্ঠানও ভার। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য্য কটুবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিল—আর সহিল না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিল। এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যান মধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া, কলিকাতায় গেল। ইতি পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোক হইয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি২ সুরাভিষিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিল। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিলনা—পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল কিছুকাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিল, এবং তথায় নূতন উপবন গৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইল।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফর্মর্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল্ স্কুলের জন্যও মধ্যে২ আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবা বিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানা রূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত—উভয়েই

বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থ বিশেষ।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর, বৈষ্ণবী বেশ ত্যাগ করিয়া, নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন।—একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল, দেবেন্দ্র কিছুকাল সেই সর্ব্বশ্রমসংহারিণী তামাকু দেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদ সুখ ভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্ব্বলোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেব-কন্যারা সর্ব্বদা যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁক্কে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণি! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিন্যস্ত ঝালর ঝলমলায়মানা! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবঙ্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজন প্রতিপালিনী, ভার্য্যাভৎসিতজন চিত্ত বিকারবিনাশিনী,—প্রভুভীতজন—সাহস প্রদায়িনী। মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে! তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধি ভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখ প্রদায়িনি! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর! তোমার সুগন্ধ দিনে২ বাড়ুক! তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘ গর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরোষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদ ভোগ করিলেন—কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চ্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণ-পটাবৃতা বোতল-বাহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উপরে, রজতাম্বুকৃতাসনে সান্ধ্যগগণশোভি-রক্তাম্বুদ তুল্য বর্ণবিশিষ্টা দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট্ গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড্ জগ্ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকুর্চ্চ পুরোহিত হট্‌ওয়াটরপ্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট্ মটন্ এবং কট্‌লেট্ নামক সুগন্ধি কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে, দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক বাদক দল আসিল। তাহারা পূজার আবশ্যকীয় সংগীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতল কান্তি এক যুবা পুরুষ আসিয়া বসিল। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্র, গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইঁহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইঁহাকে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র ইঁহাকে ভিন্ন সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সম্বাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে, সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং।

সু। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর জানিতে পারিয়াছিলে কি?

দে। না।

সু। আর যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্ব্বমত আছে।

সু। তবে এখন এসব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সাথের সাথি।

সু। সাথের সাথি কেন? সঙ্গে আসে নাই—সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু, বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?"

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে-পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর——

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসম্বাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।"

সুরেন্দ্র সজল নয়নে, মনোমধ্যে হৈমবতীকে শত২ গালি দিতে২ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমুখীর পত্র।

প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দেবী চিরায়ুষ্মতীষু।

আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও এক জন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছুই বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম "ক খ" লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিন কাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?

কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে,—বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভাল বাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা—তুমি ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, ত সে স্বামী। পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী। পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী। সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভৎর্সনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়ে মানুষ, এতক্ষণ বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন? তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য কেন এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এই জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভৎর্সনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভৎর্সনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এত কাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে

পারি,—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক ওদিক চাহে, কাহার সন্ধানে তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন, কেন তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কান তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কান তুলিয়া থাকেন, —কেন? আবার কুন্দের স্বর কানে গেলে তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারিনা। আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্ন বদন—এখন এত অন্যমনা কেন? কথা বলিলে কানে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন 'হুঁ';—আমি যদি রাগ করিয়া বলি, "আমি শীঘ্র মরি," তিনি না শুনিয়া বলেন 'হুঁ'। এত অন্যমনা কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মোকদ্দমার জ্বালায়।" আমি জানি মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনেও স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্য বৈধব্য অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম তাঁহার চক্ষুঃ জলে পুরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন এক জন নূতন দাসী রাখিয়াছি—তাহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন?

এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি আর তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক। ভালবাসা আর। ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক, সহজেই বুঝিতে পারি।

আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছে, তিনি আবার এক খানা বিধবা বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন যে, বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায়কচকচি ঠাকুর-মা স্বরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র,—বিধবা বিবাহের সপক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটী টাকা লইয়া যায়। তাহার পর দিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবা বিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবা বিবাহের দিকে নয়।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজি ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, ঠাকুরজামাইকে এ পত্র দেখাইও না।

তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।

তোমার ছেলের সম্বাদ ও ঠাকুরজামাইয়ের সম্বাদ শীঘ্র লিখিবে। ইতি।

সূর্য্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বা বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?

কমল প্রত্যুত্তর লিখিলেন,—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি দড়ি কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুর।

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সরল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘ কালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত —আমিই ভ্রান্ত। বোধ হয় তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটী ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্য্যমুখী গৃহিণী।

অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেণ্ডার পার্শে এক চীক থাকিত; চীকের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন। বারেণ্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত; তাহার মুখে সূর্য্যমুখী কথা কহিতেন। এই রূপে সূর্য্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও না কেন?"

ডাক্তার। "কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।"

সূ। "বাবু কিছু বলেন নাই?"

ডা। "না—কি অসুখ?"

সূ। "কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না—আমি জানি?"

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন, বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—ঔষধ দাও।"

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে। "যে আজ্ঞা, ঔষধের ভাবনা কি," বলিয়া পলায়ন করিল। পরে ডিস্পেন্সরিতে গিয়া একটু সোডা, একটু পোর্ট ওয়াইন, একটু সিরপফেরি-মিউরেটিস্, একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, সিসি পূরিয়া, টিকিট মারিয়া, প্রত্যহ দুই বার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল। সূর্য্য-মুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন; নগেন্দ্র সিসি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ছুড়িয়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ, আমাকে বল?"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী এক খানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী গিয়া এক জন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্য্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতি পূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায়২ রাগ।

শুধু রাগ নয়। এক দিন, রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত; নগেন্দ্র মদ্যপান করিয়াছিলেন। নগেন্দ্র কখন মদ্য পান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিত হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ ঐরূপ হইতে লাগিল। এক দিন সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটী চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোন রূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন; বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে, ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দোষ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্য্যমুখী

উত্তর করিলেন, "দোষ কি, তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখি, আমি মাতাল। মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের সম্মুখে আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মাঠাকুরাণীকে বলিও—বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফঃস্বলের আমলা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। কর্ত্তার অমনোযোগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই। আমি আপনার বিষয় রাখিতে পারিলে বাঁচি।"

ইতি পূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

এক দিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় যোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।" দোহাই হুজুর—নাএব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সুর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দেও।"

ইতি পূর্ব্বে তাঁহার এক জন গোমস্তা এক জন প্রজাকে মারিয়া একটী টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটী টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র ত পাই-ই না। যদি পাই, ত সে ছত্র ছুই, তাহার মানে মাথা মুণ্ড, কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তা বল না কেন? মোকদ্দমা হারিয়াছ? তাই বা বল না কেন? আর কিছু বল্ না বল, শারীরিক ভাল আছ কি না বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হর দেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনেং বলিলেন, "কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধুবিচ্ছেদ? দেবেন্দ্র দত্ত? না কিছুই নয়—এ প্রেম?"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহার শেষ এই, "এক বার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃৎ কেহ নাই। এক বার এসো।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহাসমর।

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন। অমনি স্বামীর কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের আয় ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরাজি সংবাদ পত্রখানি অধিকার করিয়াছিল। সতীশচন্দ্র সংবাদ পত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং করযোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ!"

(ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, "আবার শশা চুরি নাকি?"

ক। "শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।"

শ্রী। "কোথায় কি চুরি হলো?"

ক। "গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদার একটি সোণার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়ে গিয়েছে।"

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার দাদার সোণার কৌটা ত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়ি টি কি?"

ক। "সূর্য্যমুখীর বুদ্ধি খানি।"

শ্রী। "তাই লোকে বলে যে, যে খেলে সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই তোমার হাত ছাড়া হলো। তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?"

ক। "তাত জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগী এমন পত্র লিখিবে কেন?"

শ্রী। "পত্রখানি দেখিতে পাই?"

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হস্তে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমাকে এসকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে আমার আহাঁর নিদ্রা হবে না—ঘূরণী রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না। কথা টা কি তা শুনিতেও চাহিব না। এখন করিতে হবে কি তাই বল?"

ক। "কর্‌তে হবে এই—সূর্য্যমুখীর বুদ্ধি টুকু গিয়াছে, তার একটুকুঁ বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয় এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে, তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।"

সতীশবাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুল সমেত উলটাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম—ভাজের বাড়ী মশাইয়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই ,সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্য্যমুখীর কাণা কড়িটি না হারালে আর এমন কথা লিখ্‌বে কেন?"

ক। "শুধু কি তাই। সতীশের নিমন্ত্রণ, আমার নিমন্ত্রণ, আর তোমার নিমন্ত্রণ।"

শ্রী। "আমার নিমন্ত্রণ কেন?"

ক। "আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যায় কে?"

শ্রী। "এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুর জামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দুদিনের জন্য একটা ঠাকুর জামাই দেখিয়া দিতে পারি।"

কমলমণির বড় রাগ হইল। তিনি ভ্রূকুটি করিলেন, শ্রীশকে ভেঙ্গাইলেন, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজ খানায় লিখিতেছিলেন, তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। শ্রীশ হাসিয়া বলিলেন, "তা লাগ্‌তে এসো কেন!"

কমলমণি কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিলেন, "আমার খুসি, লাগ্‌বো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিলেন, "আমার খুসি বল্‌বো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইলেন। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া, ছোট হাতে একটি ছোট কিল দেখাইলেন।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। তখন বর্দ্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতি ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিলেন।

দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে মুখচুম্বন তাঁহারি ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসির লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া ভূরি২ মুখচুম্বন করিলেন। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন, এবং ভূরি২ মুখচুম্বন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার স্বর্ণময় পেন্‌সিলটি দেখিতে পাইয়া অপহরণ মানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্‌সিল্‌টি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুনপ্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বক্ষঃ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেই রূপ, কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাদের এরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে২ হইত, দণ্ডে২ যাইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, "তা সত্য সত্যই কি তোমায় গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?"

ক। "তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধ্‌তেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে। তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতীশে আমাতে দুদিকে দুজনে কাঁদ্‌তে বস্‌বো।"

শ্রী। "আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।"

ক। "আয়, সতীশ! আয়, আমরা দুজনে দুদিকে কাঁদ্‌তে বসি।"

মার আদরের ডাক সতীশের কাণে গেল—সতীশ অমনি পেন্‌সিলভেজিন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল। সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না। তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাদুরি দেখিয়া আর এক লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে, কমল আবার কহিলেন,—"এখন কি হুকুম হয়?"

শ্রী। "তুমি যাও, মানা করি না। কিন্তু তিসির মরসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই?"

শুনিয়া, কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টীপ্ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভাল বাসি।" এই বলিয়া, কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলে, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এই রূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমারি যাইবার বন্দবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। "ফিরিবে কবে?"

ক। "জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?"

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সম্বাদ রাখি যে সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে সে শ্রীশ বাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজ কর্ম্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। এ কথা শ্রীশচন্দ্র এক দিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই ত! আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ!।" কথাটা শ্রীশের কাণে গেল। তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর্। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধরা পড়িল।

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসি মুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়ীতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশ রচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না।" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছি, মাগী বুড়া বয়সে মাতায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল কোথা থেকে?" কমল, মুখ নত করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে!" মার পাজি কে!" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমণির ঐ রূপ আলাপ হইল "ওলো, কুঁদী—কুঁদী মুদী হুঁদী—ভাল আছিস ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বল্‌বি—না বলিস্ ত ঘুমিয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুন ধরিয়া দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি, চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক২ ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না ভাই! আর দুদিন থাক! তুমি গেলে আমি আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল বলিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্য্যমুখী বলিলেন "আমার কি কাজ করিবে!" কমলমণি মুখে বলিলেন "তোমার শ্রাদ্ধ," মনে২ বলিলেন, "তোমার কণ্টকোদ্ধার।"

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া২ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। কুন্দনন্দিনী বালিশে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন। চুল বাঁধা কমলের একটা রোগ। চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল।

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস্ কেন?"

কুন্দ। "তুমিই আমায় ভাল বাস।"

কম। "কেন—আর কেহ কি ভাল বাসে না?"

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

কম। "কে ভাল বাসে না? বউ ভাল বাসে না—না? আমার লুকুস্‌নে।"

কুন্দ নীরব।

কমল। "দাদা ভাল বাসে না?"

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভাল বাসি—আর তুমি আমায় ভাল বাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?"

কুন্দ ঘাড় নাড়িল। "যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "ভাল কথা ত নয়। ইট্‌টি মারিলেই পাট্‌কেলটি খেতে হয়। দাদা ইট খেয়েছেন—ছুঁড়ি পাট্‌কেল খেয়ে বসে আছে। আমার শ্রীশচন্দ্র মন্ত্রীবর কাছে নাই—কাহাকেই বা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি?"

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইয়া ধারণ করিলেন, এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি?"

কুন্দ বলিল "কি?"

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব? আমি তোর দিদি—আমি তোকে বোনের মত ভাল বাসি—আমার কাছে লুকুস্‌নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।" কমল মনে মনে

রাখিলেন, "যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশ্ বাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।"

কুন্দ বলিলেন, "কি বল ?"

ক। "তুই দাদাকে বড় ভাল বাসিস্।—না ?"

কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণির হৃদয় মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "বুঝিয়াছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে২ অনেকে মরে যে ?"

কুন্দনন্দিনী মস্তকোত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ার-মুখী চোকের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে দাদা তোকে ভাল বাসে ?"

ঘুরিয়া সেই উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেক ক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভাল বাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে, কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছিয়া কহিল, "কুন্দ ?"

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

কু। "আমার সঙ্গে চল।"

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল,

"নহিলে নয়। চক্ষের আড়াল হইলে, দাদাও ভুলিবে, তুইও ভুলিবি। নহিলে তুই বয়ে গেলি, দাদা বয়ে গেল, বউ বয়ে গেল—সোণার সংসার ছার খার গেল।"

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, "যাবি? মনে করিয়া দেখ্—দাদা কি হয়েছে, বউ কি হয়েছে?"

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "যাব।"

অনেকক্ষণ পরে কেন? কমল তাহা বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হীরা।

এমত সময় হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল।

"কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলেম কলঙ্কেরি ফুল,
গো সখি, কালকলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কাণে পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।"*

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল।

"মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।"

(*) রাগিণী শঙ্করা-আড় খেমটা।

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?"

হরিদাসী বলিল, "কেন?" কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন, "কেন? একটা বাবলার ডাল আন্ত রে—কাঁটা ফোটা কত সুখ মাগীকে দেখায়ে দিই।"

সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিল, "ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।"

হরিদাসী বলিল "আচ্ছা" বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,

স্মৃতিশাস্ত্র পড়্‌ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধোরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্ বেটী বা নিন্দে করে॥

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "ভাই, বউ—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর২ স্ত্রী লোকেরা আপন২ প্রবৃত্তিমতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল। কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই—অন্য মনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেই খানে রহিল। হরিদাসী তখন আর গান করিল না। এ দিক সেদিক বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত কথা বার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন

দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল,

"কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না। মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।"

সূর্য্য। "মেয়ে কি পুরুষ তার ঠিক কি?"

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

সূর্য্য। "আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠ!"

কমল। "রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটো দেখাই।" এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেল। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—সতীশ মামীর সিন্দুরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—এবং সিন্দূর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন—দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী বাবলার ডাল কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কিছু বিশেষ পরিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতন দান স্বীকার করিয়া, একটু ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পরিচারিকারা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্রগ্রস্ত ভদ্র লোকের কন্যারা তাঁহাদের দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেক গুলিন পরিচারিকা কায়স্থ কন্যা—হীরাও

কায়স্থ। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মাতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটী সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসী মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বালবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চরিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতি; মুখখানি যেন মেঘ ঢাকা চাঁদ; চুল গুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। হীরা আড়ালে বসে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চুণ কালি দিয়া সং সাজায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্?"

হীরা। "না। আমি কখন পাড়ার বাহির হই না—আমি বৈষ্ণব ভিখারী কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।"

সূ। "এ ঠাকুর বাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জান্‌তে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলিতে পারিস্ তবে তোকে নূতন বাণারসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।"

নূতন বাণারসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"

সূর্য্য। "তোর যখন খুসি। কিন্তু এখন ওর পাছু২ না গেলে ঠিকানা পাবিনা।"

হীরা। "আচ্ছা।"

সূর্য্য। "কিন্তু দেখিস্ যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।"

এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসী হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে ছুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্।"

হীরা বলিল; "সব পারিব, কিন্তু শুধু বাণারসী নিবনা।"

সূ। "কি নিবি?"

কমল বলিল "ও একটী বর চায়। ওর একটী বিয়ে দাও।"

সূ। "আচ্ছা তাই হবে—ঠাকুরজামাইকে মনে ধরে? বল্, তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।"

হী। "তবে দেখ্‌বো। কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটী বর আছে।"

সূ। "কে লো?"

হী। যম।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"না।"

সেই দিন প্রদোষ কালে, উদ্যান মধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া, কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃত; তাহার জল অতি পরিষ্কার, এবং সর্ব্বদা নীলপ্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান মধ্যে এক শ্বেত-প্রস্তররচিতহর্ম্ম্যসংশ্লিষ্ট লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই, পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে, দুইটি বহুকালের বড় বকুল গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া, স্বচ্ছসরোবর হৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদি সহিত আকাশ প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতক গুলিন নাল ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁঠাল, জাম, লেবু, লীচু, নারিকেল, কুল, বেল, প্রভৃতি ফলবান ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড় পাখী বিকট রব করিয়া সরোবরের শব্দহীনতা ভঙ্গ করিতেছিল। শীতল বায়ু, সরোবর পার হইয়া, ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া, আকাশ-চিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপত্র-মালায় মর্ম্মরশব্দ করিতেছিল। এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুল পুষ্পের গন্ধ চারি দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল—বকুল পুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা, এবং কামিনীর

সুগন্ধ আসিতেছিল। চারিদিকে, অন্ধকারে, খদ্যোতমালা স্বচ্ছবারির উপর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ফুটিতেছে, নিবিতেছে। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে, দুই একটা শৃগাল অন্য পশু তাড়াইবার তাহাদিগের যে শব্দ সেই শব্দ করিতেছে—দুই এক খানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে—দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ। "ভাল, সবাই আগে মলো-মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়?" পিতার পরলোক যাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখন মনে হইত না; এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল আভাসমাত্র মনে আসিল। এই মাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছিলেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি নক্ষত্র হয়? তা হলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হয়েছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্র গুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখ্‌তে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক ও আর ভাবিব না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া! জলে ডুবিয়া? বেশ ত? মরিলে নক্ষত্র হব—তা হলে—হব ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারিনে কি? আচ্ছা নাম মুখে আনিতে পারিনে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ

শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন—নগ—নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আ মলো! আমার নগেন্দ্র? আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—ডুবেই মরি! আচ্ছা যেন এখন ডুবিলেম—কাল্ ভেসে উঠবো—তবে সবাই শুন্বে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র—আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র! নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন, ত বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভাল বাসেন। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য! কমল দিদি ত বলিল—কিন্তু কমল জানিল কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভাল বাসেন? কিসে ভাল বাসেন? কি দেখে ভাল বাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি?" (এই বলিয়া কালামুখী স্বচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বলিল) "দূর হউক যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর, আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দর। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ, শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর! তা রূপ ত গোল্লাই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে।—কই, মনে ত হয় না। কমলের

মন রাখা কথা—আমায় কেন ভাল বাসিবেন? তা, কমল মন রাখা কথা বল্‌বে কেন? কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! ত মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পার্‌ব না। পার্‌ব না—পার্‌ব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাদের ত অসুখী করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে, বুঝিতে পারি। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তবে ডুবে মরি। মরিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মরিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;"—

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা, অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। "আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন—মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমাকে ঐ নক্ষত্র লোকে যাইতে বলিয়াছিলেন—আমি কেন তাঁর কথা শুন্‌লেম না—আমি কেন গেলেম না!—আমি কেন মলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।" এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল! কুন্দ নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না—প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতে ছিল—প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিত সংকল্পে সে মাতার আজ্ঞা পালনার্থ, ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমত

সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে২ তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবা মাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর মরা হলোনা।

আর নগেন্দ্র? এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র! এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা! এই কি তোমার সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি ছি! দেখ, তুমি চোঁর! তুমি চোরের অপেক্ষাও হীন। চোর সূর্য্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থ হানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণ হানি করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্য্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর!

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি—! চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনি—দেখ! পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনী মরিতে চাহে না।

চোঁর বলিল, "কুন্দ! কালি কলিকাতায় যাইবে?"

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

চোর বলিল, "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছ?"

ইচ্ছা পূর্ব্বক! হরি, হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

"কুন্দ—কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল! তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন,

"শুন কুন্দ! আমি বহুকষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি। মদ্যপ হইয়াছি। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল "না।"

আবার নগেন্দ্র বলিল, "কেন কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল "না।"

নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভাল বাসিবে কি না?"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্র মুখে, অপরিমিত প্রেম পরিপূর্ণ মর্ম্ম-ভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল "না।"

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন পুষ্করিণী নির্ম্মল, সুশীতল—কুসুমবাসসুবাসিত—পবন হিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে—ভাবিলেন "উহার মধ্যে শয়ন কেমন?"

অন্তরীক্ষে কুন্দ বলিতে লাগিল "না!" বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল। পাশে এক দিকে আলবলা। বিচিত্র রৌপ্য শৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকল কল্লোলনিনাদিনী, আলবোলা সুন্দরী দীর্ঘ ওষ্ঠ চুম্বনার্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাথার উপর সোহাগের আগুন জলিয়া উঠিল। আর এক দিকে স্ফটিক পাত্রে, হেমাঙ্গী একৃশাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের মত, এক জন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন। হুকা বলিতেছে, "দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি! ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি!" একৃশাকুমারী বলিতেছে, আগে "আমায় আদর কর! দেখ, আমি কেমন রাঙ্গা! ছি! ছি! আমায় খাও!" প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর নাক বলিতেছে, "আমি যার, তাকে একটু দিও।"

দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন—তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। একৃশানন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জ্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন—নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকারীকে "গুরুমহাশয়২" করিয়া স্থানান্তরে রখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন, এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "আবার আজি তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কাণে গিয়াছে?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কর—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায়২ ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কাহাকেও লুকাতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাব?

সু। সেও একটা বাহাদুরি মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে২ চলাতে যাও?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী, দাদা! রসকলিটি দেখে, ঘুরে পড়োনি ত?

সু। আমি সে পোড়ার মুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবীযাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রের হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন একটু বন্ধ করিয়া, জ্ঞান থাকিতে২ দুটো কথা শুন। তার পর গিলো।"

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটা চটা দেখি—হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে না কি?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্য?"

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তারা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে? সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায়। তাই তাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্ব্বৃত্তিতে তৃপ্তি জন্মাল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ দেবেন্দ্র, তুমি এত বড়

পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী, যে বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্য সহকারে এই কথা বলিলেন, যে দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে গাম্ভীর্য্য সহকারে কহিলেন;—

"তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার বশ নহে। আমি সকল ত্যাগ করিতে পারি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণায় রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী সজ্জায় সফল হইয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী।"

সু। তবে যাও কেন?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি—উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে আমার সঙ্গে তোমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়িতে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তো-

মাকেও যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র, একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া, কিয়ৎকাল বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূরহউক! এ সংসারে কে কার্! আমিই আমার!" এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া, ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন।

আমার নাম হীরা মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।

আর একজন কোথা হতে গায়িল;—

আমার নাম হীরা মালিনী।
মাতাল হয়ে বাচাল হলো, দেখিতে নারি আমি ধনী।

দেবেন্দ্র জড়ীভূত কণ্ঠে বলিলেন, "বা!" তুমি ধনী কে? ভূত না প্রেতিনী?"

তখন ঠুন্! ঠুন! ঝনাত! প্রেতিনী আসিয়া বাবুর কাছে বসিল। প্রেতিনীর ঢাকাই সাড়ী পরা, হাতে বাজু বালা, কালোচুড়ী; গলায় চিক, কণ্ঠমালা; কাণে ঝুমকা; কাঁকালে গোট; পায়ে ছয় গাছা মল। গায়ে আতর গোলাবের গন্ধ

ভুরভুর করিতেছে। দেবেন্দ্র প্রেতিনীর মুখের কাছে আলো ধরিলেন। চিনিতে পারিলেন না। চুপিং মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবাঃ, কোন্ গাছ্ থেকে?" আবার আর এক দিকে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেই রূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পার্লেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি পাঁটা দিয়ে পূজো দেব—যাও বাপ! আজ একটু কেবল ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও," এই বলিয়া মদ্যপ আগতা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে ব্রাণ্ডির গেলাস ধরিল।

স্ত্রীলোকটা তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল, এবং মৃদুহাসি হাসিয়া স্বচ্ছন্দে দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"ভাল আছ বৈষ্ণবী দিদি?"

তখন মাতাল বলিল, "বৈষ্ণবী দিদি! ও বাবা! ও গাঁয়ের দত্ত বাড়ীর পেত্নী নাকি? এই বলিয়া আবার আলো স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক ওদিক চারিদিকে আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে হীরাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল,—"তুমি কে বট হে, তোমায় চেনং করি—কোথাও দেখেছি হে।"

হীরা কহিল, "আমি হীরা।"

"Hurrah! Three Cheers for হীরা।" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস হস্তে তাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল;—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ॥
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।
যা দেবী খুকুরঘাটেষু চুপড়ি হস্তেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ॥
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটা হস্তেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ॥
যা দেবী মমগৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।
তার পর—মালিনী মাসি—কি মনে করে?"

হীরা ইতি পূর্ব্বেই বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল, যে হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে? এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনেং অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। মনেং হীরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, জলে হউক, আগুনে হউক, সে অপরিহীন সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে, রাখিয়া উন্মত্ত দেবেন্দ্রের মনের কথা জানিয়া যাইবে। হীরা ভিন্ন এত সাহস আর কাহারও হইত না।

হীরা বলিল, "মনে কোরে আর কি দত্তের বাড়ী এক ডাকাতে দিনে ডাকাতি করিয়া এসেছে, তাই ডাকাত ধর্‌তে এয়েছি।"

শুনিয়া বাবু গান ধরিলেন।

"আমার আঁটা ঘরে সিঁধ মেরেছে, কোন্ ডাকাতের এডাকাতি।
যৌবনের জেল খানাতে রাখ্‌বো তারে দিবারাতি॥
মন বাক্স তার লজ্জাতালা,
কল কোরে তার ভাঙ্গলে ডালা,

লুটে নিলে প্রেমনিধি তার,
ভাঙ্গা বাক্সে মেরে নাতি॥

তা, ডাকাতি কর্‌তে গিয়ে থাকি, গিয়াছি বাপ—কিন্তু হীরা মতির জন্যে নয়, কেবল ফুলটা ফলটা খুঁজি।”

হীরা। কি ফুল—কুন্দ?

দে। Hurrah! কুন্দকলি!—Three Cheers for কুন্দনন্দিনী! বন্দ্যাতে মন্দজাতিকং !কুন্দনন্দি-ন্দি-ন্দিনী! বলিয়াই গীত।—

কুন্দকলি মন্দ বলি নিন্দে করে কাল ভ্রমরা—

তবে—ঘেঁটু বনের মেঠো মালিনী মাসি, কি মনে কোরে?

হী। কুন্দনন্দিনীর কাছ থেকে।

দে। Hurrah! Hurrah! for কুন্দনন্দিনী। বল বলত, বলত কি বলিয়া পাঠ্যেছে? মনে পড়েছে? না হবে কেন? আজ তিন বৎসরের পীরীত!

হীরা বিস্মিত হইল। আরও বিশেষ শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিল;—

“এত দিনের পীরীত, তাহা জানিতেম না। প্রথম পীরীত হলো কেমন কোরে?”

দে। আরে, ভারি নাকি শক্ত কথা! তারার সহিত বন্ধুতা থাকাতে তাকে বলিলাম, বউ দেখা—তা সে বউ দেখালে। সেই অবধি পীরীত। কিন্তু এক গেলাস খাও বাপ, সুধু মুখে আর ভাল লাগে না।

দেবেন্দ্র তখন একপাত্র ব্রাণ্ডি হীরার হাতেদিল। হীরা তাহা হাতে করিয়া আবার নামাইয়া রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, “তার পর।”

দে। তার পর তোমাদের গিন্নীর জ্বালায় দিন কত দেখা

শুনা হয় নাই। তার পর এখন বৈষ্ণবী হয়ে যাতায়াত করিতেছি। ছুঁড়ি বড় ভয় তরাসে; কিছুতে কথা কয় না। তবে আজি যে রকম ফুশ্‌লে এয়েছি, তাতে ছাড়ায় না—না হবে কেন—আমি দেবেন্দ্র।—অহং দেবেন্দ্র বাবু—হেউ! "শিখে হো ছুল ভেলা নট নাগর"—তার পর মালিনী মাসি? কি বলিয়া পাঠিয়েছে? ভাল আছ ত, মালিনী মাসি? প্রাতঃ প্রণাম।

হীরা প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবেন্দ্রের এই সকল কথা বাহির হইতে শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া বলিল, "রাত্রি ঢের হইল, এখন প্রণাম হই।" এই বলিয়া, হীরা মৃদুহাসি হাসিয়া, দণ্ডবৎ হইয়া, প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র তখন, ঝিমকিনি মারিয়া গায়িতে লাগিল;—

বয়স তাহার বছর ষোল,
দেখ্‌তে শুন্‌তে কালো কোলো,
পিলে অগ্র মাসে মোলো,
আমি তখন খানায় পোড়ে।
যেতেছিল বলদ একটা,
তেঠেঙ্গো এক ঘোড়ায় চোড়ে।

সে রাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ী গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট, দেবেন্দ্রের কথিত মত, তাহার সহিত কুন্দনন্দিনীর তিন বৎসর অবধি প্রণয়ের বৃত্তান্ত বিবৃত করিল এবং ইহাও প্রতিপন্ন করিল, যে এক্ষণে দেবেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর জার স্বরূপ বৈষ্ণবী বেশে যাতায়াত করিতেছে।

শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে, শিরা স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল।

কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পরে বলিলেন;—

"কুন্দ! হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোমার উপপতি। তুই যা, তা জানিলাম। আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।"

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন। শয্যা গৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন, এবং বলিলেন, "বউ যাহা বলে, বলুক; আমি উহার একটি কথাও বিশ্বাস করি না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনাথিনী।

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশবর্ষীয়া, অনাথিনী সংসার সমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার। অল্প২ মেঘ করিয়াছে, কোথায় পথ?

কে বলিয়া দিবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই। কোন্ দিকে কোথা যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর, কোথায়ই বা যাইবে?

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেঁড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়ন কক্ষের বাতায়ন পথের আলো দেখিয়া যায়। এক বার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে২ তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়ন পথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সাসী বন্ধ—অন্ধকার মধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গজাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, কাঁচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয় মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী মুগ্ধ লোচনে সেই গবাক্ষ পথপ্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতক গুলিন ঝাউ গাছ ছিল—কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার, গাছে২ খদ্যোতের চাকচিক্য সহস্রে২ ফুটিতেছে, মুদিতেছে, মুদিতেছে ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাৎ আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতে আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখন মেঘে ডুবিতেছে, কখন ভাসিতেছে। বাড়ীর চারি দিকে ঝাউ গাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া, নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন২ পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে। পিশাচেরাও করাল রাত্রির ভয়ে, অল্প শব্দে কথা

কহিতেছে। কদাচিৎ বায়ুর সঞ্চালনে; গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেক মাত্র আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কাল পেঁচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিৎ একটা কুক্কুর, অন্য পশু দেখিয়া, সম্মুখ দিয়া অতি দ্রুত বেগে ছুটিতেছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব অথবা ফল, খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার, শিরোভাগ অন্ধকারে মন্দ২ হেলিতেছে; দূর হইতে তাল বৃক্ষের পত্রের তর২ মর্ম্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে; সর্ব্বোপরি সেই বাতায়ন শ্রেণীর উজ্জল আলো জ্বলিতেছে—আর পতঙ্গদল ফিরিয়া২ আসিতেছে। কুন্দনন্দিনী সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

ধীরে২ একটী গবাক্ষের সাসী খুলিল। এক মনুষ্যমূর্ত্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! সে নগেন্দ্রের মূর্ত্তি। নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক্ষ পথে দেখিয়া তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ—ছুপ! ছুপ! শব্দ—যদি শুনিতে পাইতে—যদি জানিতে পারিতে, যে তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না! নগেন্দ্র! দীপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ—একবার দীপ সম্মুখেকরিয়া দাঁড়াও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ দুঃখিনী। দাঁড়াও—তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি—তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া—তাহার আর মনে পড়িবে না।

ঐ শুন! কাল পেঁচা ডাকিল! তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে! দেখিলে বিদ্যুৎ! তুমি সরিও না—কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে। ঐ দেখ, আবার কালো মেঘ পবনে চালিয়া যেন যুদ্ধে ছুটিতেছে। ঝড় বৃষ্টি হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে২ পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গ জন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায়। মনে করিতেছে, "আমি পুড়িলাম—মরিলাম না কেন?"

নগেন্দ্র সাসী বন্ধ করিয়া সরিয়া গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমার রাত্রি জাগিয়া কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শরীর অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মরে মরুক। তোমার মাথা না ধরে, কুন্দনন্দিনীর কামনা এই।

এখন আলোকময় গবাক্ষ যেন অন্ধকার হইল। চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল—সেই পথে চলিল। কোথায় চলিল? নিশাচর পিশাচ ঝাউ গাছেরা সর২ শব্দ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"কোথায় যাও?" তালগাছেরা তর২ শব্দ করিয়া বলিল, "কোথা যাও?" পেচক গম্ভীর নাদে বলিল, "কোথায় যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষ শ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায় যাউক—আমরা আর নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী, ফিরিয়া২ সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

ও সূর্য্যমুখি! রাক্ষসি! ওঠ! দেখ আপনার কীর্ত্তি দেখ! অনাথিনীকে ফেরাও!

কুন্দ চলিল চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আরও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইয়া আকাশেও রাত্রি করিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবার হাসিল—আবার! বায়ু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল—বায়ুতে মেঘেতে একত্র হইয়া গর্জ্জিল। আকাশ আর রাত্রি একত্র হইয়া গর্জ্জিল। কুন্দ! কুন্দ! কোথায় যাইবে?

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি উঠিল, পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া বায়ু স্বয়ং আসিল! শেষে পিট পিট!—পট পট!—হুহু! বৃষ্টি আসিল, একবসনা কুন্দ! কোথায় যাইবে?

বিদ্যুতের আলোকে পথপার্শ্বে কুন্দ একটি সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহের চতুঃপার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর; মৃৎপ্রাচীরে ছোট চাল। কুন্দনন্দিনী আসিয়া, তাহার আশ্রয়ে, দ্বারের নিকট বসিল। দ্বারে পিঠ রাখিয়া বসিল। দ্বার পিঠের স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বারের শব্দ তাহার কাণে গেল। গৃহস্থ মনে করিল, ঝড়; কিন্তু তাহার দ্বারে একটা কুক্কুর শয়ন করিয়া থাকে—সেটা উঠিয়া ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয় পাইল। মন্দ আশঙ্কায় দ্বার খুলিয়া দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোকমাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

"কেঁরে মাগি"

কুন্দ বলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি? কি? কি? আবার বল ত?"

কুন্দবলিল, "বৃষ্টির জন্য দাঁড়াইয়াছি।"

গৃহস্থ বলিল, "ও গলা যে চিনি। বটে? ঘরের ভিতর এসো ত।"

গৃহস্থ কুন্দকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। আগুন করিয়া আলো জ্বালিল কুন্দ তখন দেখিল—হীরা।

হীরা বলিল, "বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এই খানে দুই দিন থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরার রাগ।

হীরার বাড়ী প্রাচীর আঁটা। দুইটি ঝর্ ঝোরে মেটে ঘর। তাহাতে আল্পনা—পদ্ম আঁকা—পাখী আঁকা—ঠাকুর আঁকা। উঠান নিকান—এক পাশে রাঙ্গা শাক, তার কাছে দোপাটি, মল্লিকা গোলাপ ফুল। বাবুর বাড়ীর মালী আপনি আসিয়া চারা আনিয়া ফুলগাছ পুতিয়া দিয়া গিয়াছিল—হীরা চাহিলে, চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা কালো চুড়ি পরা হাতখানিতে হুঁকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে!

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আর হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেই খানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলা আয়ী যখন স্নানে যায়, তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ের শয্যা রচনা করিল।

"টিট্—কিট্—খিট্—খিটি—খাট্" বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। এক জনমাত্র কখন২ রাত্রে শিকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান্, দাঁত ভিত

ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নড়িলে, বলে, "কট কট কটাং, তোর মাথা মুণ্ড উঠা, কড়্ কড়্ কড়াং, খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তাত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটী, দেখি কেমন আমার হীরেটি, খিট খাট ছন্, উঠলো আমার হীরামন্। ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনিক্— আয়রে আমার হীরা মাণিক।" হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল। বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—"কে ও, গঙ্গাজল! একি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিক স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী— একটু রৌদ্র পোড়া—মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক খাঁদা—কপালে উল্‌কী। কসে তামাকুপোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস—যাহা অন্যের অসাধ্য—তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ভাই গঙ্গাজল! অন্তিমকালে যেন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।"

হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি না কি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস্! এখন চ।"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আবার বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকিতে এসেছে। কে জানে কেন?" বলিয়া

প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশ ভূষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়।
সাগর ছেঁচে তুল্‌ব নাগর পতন করো্য কায়॥

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজি সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টনটনে। হীরার সঙ্গে আজি অন্য প্রকার সম্ভাষণ করিলেন। স্তব স্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরে, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুমি বলিয়াছিলে; কুন্দনন্দিনী তোমাকে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে কি বলিয়াছিল, তাহা কিছুই বলিয়া যাও নাই। বোধ হয়, আমাকে বিবশ দেখিয়া সে সকল কথা বল নাই। আজি বলিতে পার।"

হী। "কুন্দনন্দিনী কিছুই বলিয়া পাঠান নাই।"

দে। "তবে তুমি কেন আসিয়াছিলে?"

হী। "কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।"

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী পেয়েছেন। বুঝিলাম, কুন্দনন্দিনীর কথা ছল মাত্র। তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা, এক প্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া

প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর, আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে, হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণরন্ধ্রে অগ্নি-বৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেক কাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া দুই গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্র-কৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গায়িলেন।

"এসেছিল বক্‌না গোরু পর গোয়ালে জাবনা খেতে"

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

হীরার দ্বেষ।

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে রাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়া প্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাঁহাকে শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা

শুনিয়া কুন্দ, আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে২ পাড়ায়২ কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাই-লেন।

সূর্য্যমুখী রাগে বা ঈর্ষার বশীভূত হইয়া যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেননা দেবেন্দ্রের সহিত তিন বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্ত প্রণয় হইলে কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্য্য-মুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামীর বিরাগে আরও মর্ম্ম ব্যথা পাইলেন। শতবার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্রবার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—সূর্য্যমুখীকেও অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া লইয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।"

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিন্তু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল—কিন্তু সে

লোভ সম্বরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ স্যারিয়া দুই প্রহরের সময়ে, আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া, কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখদুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল, তাহা মুখে অবাচ্য—অতি গোপন।

ও হীরে! ছি! ছি! হীরে! মুখখানিত দেখিতে মন্দ নয়—বয়সও নবীন, তবে হৃদয়মধ্যে এত খলকপট কেন? কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্য্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত? হীরা বলে, "না।" হীরাকে হীরার আসনে বসাইয়াছে বলিয়াই হীরা, হীরা। লোকে বলে, "সকলই দুষ্টের দোষ।" দুষ্ট বলে, "আমি ভাল মানুষ হইতাম—কিন্তু লোকের দোষে দুষ্ট হইয়াছি।" লোকে বলে, "পাঁচ কেন সাত হইল না?" পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম—কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত—বিধাতা, অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হইলেই আমি সাত হইতাম।" হীরা তাহাই ভাবিতেছিল।

হীরা ভাবিতেছিল—"এখন কি করি! পরমেশ্বর যদি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তবে আপনার দোষে সব নষ্ট না হয়। একদিকে, যদি কুন্দকে দত্তের বাড়ী ফিরিয়া লইয়া যাই, তবে কমল হার দিবে, গৃহিণীও কিছু দেবেন—বাবুকেই কি ছাড়িব? আর যদি এদিকে কুন্দকে দেবেন্দ্র বাবুর হাতে দিই, তা হলে অনেক টাকা নগদ পাই। কিন্তু সে ত প্রাণ থাকিতে পারিব

না। আচ্ছা, দেবেন্দ্র কুন্দকে কি এত সুন্দরী দেখেছে? আমরা গতর খাটিয়ে খাই; আমরাও যদি ভাল খাই, ভাল পরি, পটের বিবির মত ঘরে তোলা থাকি, তা হলে আমরাও অমন হতে পারি। আর এটা মিন মিনে, ঘ্যান ঘেনে, প্যান পেনে, সে দেবেন্দ্র বাবুর মর্ম্ম বুঝিবে কি? পাঁক নইলে পদ্ম ফুল ফুটে না, আর কুন্দ নইলে দেবেন্দ্র বাবুর পিরীত হয় না! তা যার কপালে যা, আমি রাগ করি কেন? রাগ করি কেন? হাঃ কপাল। আর মনকে চোখ ঠারয়ে কি হবে! ভালবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম! বলিতাম, ও সব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করেছিলাম, যে ভালবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখন কাহাকে ভাল বাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ; তোরে মজা দেখাচ্ছি। শেষে বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান। পরের চোর ধর্‌তে গিয়া আপনার প্রাণটা চুরি গেল। কি মুখ খানি! কি গড়ন! কি গলা! অন্য মানুষের কি এমন আছে? আবার মিন্‌সে আমায় বলে, কুন্দকে এনে দে! আর বল্‌তে লোক পেলেন না! মারি মিন্‌সের নাকে এক কিল। আহা, এমনই ভাল বাসিতে আরম্ভ করেছি, যে তার নাকে কিল মেরেও সুখ। দূর হোক, ওসব কথা যাক্। ওপথেও ত ধর্ম্মের কাঁটা। ইহজন্মের সুখ দুঃখ অনেক কাল ঠাকুরদের দিয়াছি। তাই বলিয়া কুন্দকে দেবেন্দ্রের হাতে দিতে পারিব না। সে কথা মনে হলেই গা জ্বালা করে। বরং কুন্দ যাহাতে কখন তার হাতে না পড়ে, তাই করিব। কি করিলে তাহা হয়! কুন্দ যেখানে ছিল—সেই খানে থাকিলেই তার হাত ছাড়া। সে বৈষ্ণবীই সাজুক, আর বাসুদেবই সাজুক, সে বাড়ীর ভিতর দন্তস্ফুট হইবে না! তবে সেই খানে কুন্দকে ফিরিয়া রাখিয়া

আমাই মত। কিন্তু কুন্দ যাইবে না—আর সে বাড়ী মুখো হইবার মত নাই। কিন্তু যদি সবাই মেলে বাপু বাছা বলে লইয়া যায়, তবে যাইতেও পারে। আর একটা আমার মনের কথা আছে, ঈশ্বর তাহা কি কর্‌বেন? সূর্য্যমুখীর থোতা মুখ ভোতা হবে! দেবতা করিলে হতেও পারে। আচ্ছা! সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন, বল্‌বো? সূর্য্যমুখী সুখী, আমি দুঃখী, এই জন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট, সে মুনিব, আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? তা, আমি খামখা তার মন্দ করিতে চাই না, কিন্তু যদি তার মন্দ করিলে আমার ভাল হয়, তবে না করি কেন? আপনার ভাল কে না করে? তা, হিসাব করিয়া দেখি, কিসে কি হয়। এখন, আমার হলো কিছু টাকার দরকার, আর দাসীপনা পারি না। টাকা আসিবে কোথা থেকে? দত্ত বাড়ী বই আর টাকা কোথা? তা দত্তবাড়ীর টাকা নেবার ফিকির এই,—সবাই জানে যে কুন্দের উপর নগেন্দ্র বাবুর চোখ পড়েছে—বাবু এখন কুন্দমন্ত্রের উপাসক। বড় মানুষ লোক, মনে করিলেই পারে। পারে না কেবল সূর্য্যমুখীর জন্যে। যদি দুজনে একটা চটাচটি হয়, তাহলে আর বড় সূর্য্যমুখীর খাতির কর্‌বে না। এখন যাতে একটু চটাচটি হয়, সেই টা আমায় করিতে হবে।

"তা হলেই বাবু ষোড়শোপচারে কুন্দের পূজা আরম্ভ করি-

বেন। এখন কুন্দ হলো বোকা মেয়ে, আমি হলেম শিয়ানা মেয়ে; আমি কুন্দকে শীঘ্র বশ করিতে পারিব। এরি মধ্যে তাহার অনেক যোগাড় হয়ে রয়েছে। মনে কর্‌লে কুন্দকে যা ইচ্ছা করি, তাই করাতে পারি। আর যদি বাবু কুন্দের পূজা আরম্ভ করেন, তবে তিনি হবেন কুন্দের আজ্ঞাকারী। কুন্দকে কর্‌বো আমার আজ্ঞাকারী। সুতরাং পূজার ছোলাটা কলাটা আমিও পাব। যদি আর দাসীপনা করিতে না হয়, এমন টা হয়, তা হলেই আমার হলো। দেখি, দুর্গা কি করেন। নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দেব। কিন্তু হঠাৎ না। আগে কিছু দিন লুকিয়ে রেখে দেখি। প্রেমের পাক বিচ্ছেদে। বিচ্ছেদে পড়িলেই বাবুর ভালবাসাটা পেকে আস্‌বে। সেই সময়ে কুন্দকে বাহির করিয়া দিব। তাতে যদি সূর্য্যমুখীর কপাল না ভাঙ্গে, তবে তার বড় জোর কপাল। ততদিন আমি বসে২ কুন্দকে উঠ্ বস্ করান মক্‌শ করাই। আগে আয়ীকে কামারঘাটা পাঠাইয়া দিই, নইলে কুন্দকে আর লুকিয়ে রাখা যায় না!"

এই রূপ কল্পনা করিয়া পাপিষ্ঠা হীরা সেই রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইল। ছল করিয়া, আয়ীকে কামারঘাটা গ্রামে কুটুম্ব-বাড়ী পাঠাইয়া দিল, এবং কুন্দকে অতি সঙ্গোপনে আপন বাড়ীতে রাখিল। কুন্দ, তাহার যত্ন ও সহৃদয়তা দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, "হীরার মত মানুষ আর নাই। কমলও আমার এত ভাল বাসে না।"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল।

তা ত হলো। কুন্দ বশ হবে। কিন্তু সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের দুই চক্ষের বিষ না হইলে ত কিছুতেই কিছু হবে না। গোড়ার কাজ সেই। হীরা এক্ষণে তাহাদের অভিন্ন হৃদয় ভিন্ন করিবার চেষ্টায় রহিল।

এক দিন প্রভাত হইলে পাপ হীরা মনিব বাড়ী আসিয়া গৃহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা নাম্নী আর এক জন পরিচারিকা দত্তগৃহে কাজ করিত, এবং হীরা প্রধানা বলিয়া ও প্রভুপত্নীর প্রসাদ পুরস্কারভাগিনী বলিয়া তাহার হিংসা করিত। হীরা তাহাকে বলিল, "কুশি দিদি! আজ আমার গা কেমন২ কর্‌তেছে, তুই আমার কাজ গুল কর না?" কৌশল্যা হীরাকে ভয় করিত, অগত্যা স্বীকৃতা হইয়া বলিল, "তা করিব বই কি। সকলেরই ভাই শরীরের ভাল মন্দ আছে—তা এক মুনিবের চাকর,—করিব না?" হীরার ইচ্ছা ছিল যে, কৌশল্যা যে উত্তরই দিউক না, তাহাতেই ছল ধরিয়া কলহ করিবে। অতএব তখন মস্তক হেলাইয়া, তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি লা কুশি—তোর যে বড় আস্পর্দ্ধা দেখ্‌তে পাই? তুই গালি দিস্?" কৌশল্যা চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আ মরি! আমি কখন গালি দিলাম?"

হীরা। আ মোলো! আবার বলে কখন গাল্ দিলাম? কেন শরীরের ভাল মন্দ কি লা! আমি কি মর্‌তে বসেছি না কি? আমাকে শরীরের ভাল মন্দ দেখাবেন, আবার লোকে বল্‌বে উনি আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন! তোর শরীরের ভাল মন্দ হউক।

কৌ। হয় হউক। তা বল্ রাগ করিস্ কেন? মরিতে ত হবেই এক দিন—যম ত আর তোকেও ভুল্‌বে না, আমাকেও ভুল্‌বে না।

হীরা। তোমাকে যেন প্রাতর্বাক্যে কখন না ভোলে! তুমি আমার হিংসায় মর! তুমি যেন হিংসাতেই মর! শীগ্‌গির অল্লাই যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও, নিপাত যাও! তুমি যেন দুটি চক্ষের মাথা খাও!

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল। "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও! তুমি নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ার মুখি! আবাগি! শতেক খোয়ারি!" কোন্দল বিদ্যায় হীরার অপেক্ষায় কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাট্‌কেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল যাইবার সময় যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অধরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধ লক্ষণ—এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িল, অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্য্যমুখী নালিশী আরজি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বড় বিরক্ত হইলেন। বলি-লেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি

গাল্—দোষ সব তোর—আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয়, যা, আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়। তখন "আচ্ছা চল্লেম," বলিয়া হীরা চক্ষুর জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরা, কাঁদিতেছিস্ কেন?"

হী। আমার মাহিয়ানা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন।—(সবিস্ময়ে) সেকি? কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মাঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই?

হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন; "সে কাযের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি, বল্।"

হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মাঠাকুরাণীর মুখ বড় এলো মেলো হয়েছে—কারে কখন কি বলেন; ঠিকানা নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "সেকি?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এই বার বলিল, "সে দিন কুন্দনন্দিনী ঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দ ঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেই রূপ কোন্ দিন কি বলেন,—আমরা তাহলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

নগেন্দ্র। সে কি কথা?

হীরা। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া নগেন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, "আজ্ বাড়ী যা। কাল্ ডাকাব।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টি-পিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দি-য়াছি।" অনন্তর হীরা কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবরিত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক। তুমি কুন্দ-নন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অ-স্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

নগেন্দ্র। কোন দুর্ব্বাক্য?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিত, তাহাই বলিলেন।

বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল। তোমার কাছে আমি কেন লুকাইব?

কখন কোন কথা তোমার কাছে লুকাই নাই, আজ কেন এক জন পরের কথা তোমার কাছে লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া, তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। সে অপরাধ মার্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দ-নন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষ কহিলেন, "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আ-পনার মরণে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই। তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্র লোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না? তুমি তারাচরণের কোন্ দিনের ঘরের খবর না জানিতে? কুন্দের সঙ্গে যে প্রকারে দেবেন্দ্রের যেরূপ তিন বৎসরের আলাপ, তাই কোন্ না শুনিয়াছ? তবে মাতালের কথায় বিশ্বাস ক-রিলে কেন?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে২ সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা সাধ্বী—নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়ন জলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন,

"প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগল চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশিরসিক্তকমলতুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামিমুখ প্রতি চাহিয়া, বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি—তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে; আমি যথার্থ, আন্তরিক অপকটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখি! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই। আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে —কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি; তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড় হাত করিয়া, কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—

আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতিকথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না। তা নয়, সূর্য্যমুখি! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেননা অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আমার সুখ নাই। তোমাতে আমার আর সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ দেশান্তরে ফিরিব। তুমি এগৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও, তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব না? এখন আমি দেশ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।"

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিলেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবী পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হতজীবের মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র, সেই রূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতীকার

করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে কি সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

ক্ষণেকপরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন,—

"এক ভিক্ষা।"

নগ। কি?

সূ। আর এক মাস মাত্র গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশ ত্যাগ করিও। আমি মানা করি না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখী তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

চোরের উপর বাটপাড়ি।

হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সম্বাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে। কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে

দিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সে দিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসী মহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এই রূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।—

দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতী গোয়ালিনীর কিছু ঘনং যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্ট নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে। সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালা চাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা চাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনেং ভাবিতে লাগিল —মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, উপপতি। কিন্তু কে কার উপপতি, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষে তাহার মনেং সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল।

হীরা বাবুদিগের বাড়ীহইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে বাহিরে পলায়ন করিল। দেখিয়া, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎং গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে, মালতী আছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল "ওমা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে২ কুন্দের ঘরে ঘা মারিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল—"কুন্দ ঠাকুরুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হইয়াছে।" সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া ঘর খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হিঽ করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্পার কি ওস্পার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা "পার্টি" ছিল —সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পর দিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পিঞ্জরের পাখী।

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল।" দুইটি ভিন্নদিগাভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগ বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে তাহাই হইল। এ দিকে মহালজ্জা—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সেই লজ্জাস্রোতের উপরে প্রণয়স্রোতঃ আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয় প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে

ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? ছুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল। আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে এক বারও দেখিতে পাই না! তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয়?" কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা ছুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায়। তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কি না, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দ্দশা হইল, যে সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাহাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইবে? একা ত যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তাহলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এক দিন ছুই চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত, নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণ পক্ষাবশেষ, ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি২ অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ

শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্র শৈবালাদি সমাচ্ছন্ন জলে, বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্ট লক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর অতি নিবীড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুকুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রকৃতি স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে, সন্দেহমন্দ পদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে—ইতিমধ্যে একদিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কিন্তু লুকাইয়া দেখিবে কখন্? কি প্রকারে? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্তদিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারিদিকে বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই কুন্দ অমনি ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এই রূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রগৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকাসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথ পানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই—ছাদ পানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক—আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীরব মধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপরে বৃক্ষস্থ পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকা রক্ষক দ্বার-

বানগণকৃত দ্বারোদ্ঘাটনের ও অবরোধের শব্দ মধ্যে২ শুনা যাইতেছিল। শেষে উষাসমাগম শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউ গাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ড গোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল—আর ত ঝাউ তলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল—কেহ যে দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থে কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুর সংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ুসেবন করিয়া থাকেন। হয় ত নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত। খিড়কির দ্বার মুক্ত না হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কির দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং উদ্যান প্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুল বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজি পরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে প্রস্তর রচিত সুন্দর পথ, স্থানে২ শ্বেত রক্ত নীল পীত বর্ণ বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাত-মধুলুব্ধ মক্ষিকা সকল দলে দলে ভ্রমিতেছে—বসিতেছে উড়িতেছে—গুন্ গুন্ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে২ ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত

পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ অরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাত বায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্প ভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখা সকল দুলিতেছে না, কেননা তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালিবর্ণ লুকাইয়া গলা বাজিতে সকলকে জিতিতেছে।

উদ্যান মধ্যস্থলে, একটি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত লতামণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্প ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যান মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, যে তাহার প্রস্তর নির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে২ বৃক্ষের অন্তরালে২ থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসরও হইতে পারিল না—পশ্চাদপসৃতাও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যান মধ্যে পুষ্পচয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখানে কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকেই আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে

পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি?"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন। বলিলেন,

"কুন্দ? এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অবতরণ।

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত, একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া, কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়ীতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস্ কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে—আমার খানা তল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহা২ জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, "প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে২ বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা, আর একটু বসিয়া ভাব গতিক বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কানা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাত্রি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহাহইলে অধঃপাতের সোপানে আর এক পদ নামিতে হয়। কিন্তু তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন,

"তোমার এখানে একটু বসিয়া জল টা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসাতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি?

হীরা উত্তর করিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিন্ধুক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপা বাঁধা হুক্কা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পূরিয়া মিটাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতার নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন, এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোল কটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা।

পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্২ করিয়া গান করিতে২ সেই বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা খাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "একজন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।"

দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া এক প্রকার চলন সই করিয়া লইলেন, এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ, মধুর ভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জলিতে লাগিল। ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়-সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্ত স্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন,

"সে কি, হীরা?"

হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হীরা। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন।

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র!

হীরা রাগিল—বলিল "স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ীতে বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড় মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।"

দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গী করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া কোমলতরস্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভো, আমি আপনার রূপ গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই—কিন্তু অবলা, স্ত্রীজাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ, এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আপনি এখান হইতে যান্।"

দেবেন্দ্র আর এক গ্লাস পান করিয়া বলিলেন, "ভাল; ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজে এক দিন বক্তৃতা দিবে?"

হীরা এই উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, রোষ-কাতরস্বরে কহিল, "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে

অতি অধম লোকে ভাল বাসিলেও, তাহার ভাল বাসা লইয়া রহস্য করা কর্ত্তব্য নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—এবং ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে২ প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কখন কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে এতটুকুও ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্ম জ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভাল বাসেন না—সেখানে কি সুখের বিনিময়ে কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে আমার স্বাধীনতা ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ত্যাগ করেন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কাল আমাকে হয় ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি স্মরণ রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার অধীন হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভাল বাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।”

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এইরূপ তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনে২ ভাবিলেন, “আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যে দিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।” এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

খোস্‌খবর।

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোক জন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছে। বৈঠকখানার চাবি বন্ধ, একটা দোআঁসলা গোছ টেরিয়র বৈঠকখানার বাহিরে,পাপোষের উপর, পায়ের ভিতর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাক খাইতেছে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সূচি হস্তে কারপেট তুলিতেছেন—কেশ বেশ একটু একটু আলু থালু—কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন, এবং লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উল্ গুলিন অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া, একটা মৃণ্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ড লেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; দূরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ভাব অতি গম্ভীর; মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ; এবং চিত্ত চাঞ্চল্যশূন্য। বোধ হয়, বিড়াল ভাবিতেছিল, "মনুষ্যের দশা অতি ভয়ানক; সর্ব্বদা কার্পেট তোলা, পুতুল খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মন নিবিষ্ট, ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি নাই, বিড়াল জাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে?" অন্যত্র একটা টিকটিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সেও মক্ষিকা জাতির দুশ্চরিত্রের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল সন্দেহ নাই। একটী প্রজাপতি উড়িয়া

বেড়াইতেছিল; সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল—পিপীলিকারাও সার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে, টিকটিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্যদিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্যচরিত্র পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া, হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কারপেট রাখিলেন। এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, "অ সতুবাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন, বলিতে পার?" সতুবাবু বলিলেন, "ইলি—লি—ব্লিঃ!"

ক। সতুবাবু, তুমি কখন আপিসে যেও না।

সতু বলিল, "হাম্!"

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করার ভাবনা কি? তোমাকে হাম্ করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না—আপিসে গেলে বৌ দুপর বেলা বসে বসে কাঁদবে!"

সতুবাবু বৌ কথাটা বুঝিলেন, কেননা কমলমণি সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে বৌ আসিয়া মারিবে। সতুবাবু এবার উত্তর করিলেন।

"বৌ—মাবে!"

কমল বলিলেন, "মনে থাকে যেন। আপিসে গেলে বৌ মারিবে।"

এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না, কেন না এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া এক খানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া,

আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ণ মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ;—

"প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে একখানি বই পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সম্বাদের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে—ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোসখবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও, কেন না তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।"

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ ততক্ষণ সম্মুখে, একখানা বাঙ্গালা কেতাব পাইয়া তাহার কোণ্ খাইতেছিল, কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি, বল দেখি সতু বাবু?" সতুবাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন। সতুবাবুর নাসিকা ভোজন সমাপ্ত হইলে, কমলমণি আবার সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ সতুবাবুর কর্ম্ম নয়, এ আমার সেই মন্ত্রীটি নইলে হইবে না। মন্ত্রীর আপিস কি ফুরায় না? সতুবাবু, আজ এস, আমরা রাগ করিয়া থাকি।"

যথা সময়ে মন্ত্রিবর শ্রীশচন্দ্র আপিস্ হইতে আসিয়া ধড়া চূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া গিয়া খাটের উপর শুইলেন। শ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকা লইয়া দূরে কৌচের উপর গিয়া বসিলেন। হুঁকাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "হে হুঁক্কে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে! নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এই খানে বসিয়া বসিয়া দশ ছিলিম তামাক্ পোড়াব!" শুনিয়া, কমলমণি উঠিয়া বসিয়া, মধুর কোপে, নীলোৎপল তুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "আর দশ ছিলিম তামাক মানে না! এক ছিলিমের টানের জালায় আমি একটি কথা কইতে পাই না—আবার দশ ছিলিম তামাক খায় —আমি আর কি ভেসে এয়েছি!" এই বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হুঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাকু ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিলেন।

এইরূপে কমলমণির দুর্জ্জয় মান ভঞ্জন হইলে, তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে দিলেন, এবং বলিলেন, "ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নহিলে আজ মন্ত্রিবরের মাহিয়ানা কাটিব।"

শ্রীশ। বরং আগাম মাহিয়ানা দাও—অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাহিয়ানা আদায় করিলেন। তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা!"

ক। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা না পত্রখানা?

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। আজি মন্ত্রিমশাইকে ডিশ্চার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধি টুকুও নাই? মেয়ে মানুষে কি এমন তামাসা মুখে আনিতে পারে?

শ্রীশ। তবে যা তামাসা কোরে পারে না তা কি সত্যং পারে?

কম। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয়, এ সত্য?

শ্রীশ। সে কি! সত্য, সত্য?

কম। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন;—

"আচ্ছা, মিথ্যা বলি, ত কমলমণির সতিনের মাথা খাই।"

শ্রীশ। তা হলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

কম। ভাল, কারু মাথা নাই খেলেম—এখন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খায়। দাদা বুঝি জোর কোরে বিয়ে কর্‌তেছে?

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।—নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?"

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহাএই;—

"ভাই! আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকিও নাই।

"এ কথা বলার পর, আর বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয়, ইহার পর আর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

"যদি কেহ বলে যে বিধবা বিবাহ হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত; তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্র সম্মত হইলেও ইহা সমাজ সম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে, কার্ সাধ্য? যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে, ইহা নীতিবিরুদ্ধ কাজ? তুমি এ কথা ইংরাজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে একথা ছিল না। কিন্তু ইংরাজেরা কি অভ্রান্ত? মূসার বিধি আছে বলিয়া ইংরাজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি মূসার বিধি ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বলিব?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃ নিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক তাহাই নীতিবিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতিবিরুদ্ধ বিবেচনা

কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্ট-কর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া তুমি আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে, আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নী কণ্টক করি কেন? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনিই বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার্ আপত্তি?

"তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

কাহার্ আপত্তি?

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, "কোন্ কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন! কিন্তু কি ভ্রম! পুরুষে বুঝি কিছুই বুঝে না। যা হৌক, মন্ত্রিবর, আপনি সজ্জা করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"

শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে।?

কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।

তখন উভয়ে গোবিন্দপুর যাত্রার উদ্যোগ পাইতে লাগি-

লেন। পর দিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমণিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সতীশ যে পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, অস্পষ্ট স্বরে, সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সূর্য্যমুখী কোথায়?" মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে, সূর্য্যমুখী মরিয়াছে।

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়ন কক্ষে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়ন কক্ষে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে দেখিতে পাইলেন; কক্ষ প্রান্তে, এক রুদ্ধগবাক্ষ সন্নিধানে, অধোবদনে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাঁহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু চিনিলেন যে সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী তাঁহার পদধ্বনি পাইয়া উঠিয়া কাছে আসিলেন। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া কমলমণি,—বিবাহ হইয়াছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—সূর্য্যমুখীর কাঁদের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে—নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া

পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে—সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো?" সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল।"

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কাহাকে কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার রুক্ষ কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক২ বার মাত্র মনে পড়িতেছিল, "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে আর কাহার্ আপত্তি?"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমুখী ও কমলমণি।

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহবৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন;—

"এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?"—মৃদু, ক্ষীণ হাসি

হাসিয়া উত্তর করিলেন,—বৃষ্টির পর আকাশ প্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেই রূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে? একবার তোমার দাদাকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস?—তখন জানিবে, তোমার দাদা আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম, দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিলেন—তবে আমার সুখ কি রহিল? বলিলাম, "প্রভো! তোমার সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর —আমি সুখী হইব,—তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

কমল। আর, তুমি কি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখন স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যে আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা রাখিয়া যাইতেন

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেরে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয়? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে?"

সূ। আমার কপালের চেয়ে কার্ কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ— সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীর? আমার কপাল জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল।

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীর আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া, সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ।

সূর্য্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল,—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন;—

"তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দাহ হতেছে। তবে কেন বল "আমি কে?" তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণের ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া, আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায়—সকল কথা ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে২ কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে২ কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে২ সূর্য্যমুখী বুঝিতেছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী

তখন আপনার কথা ত্যাগ করিয়া, অন্যান্য কথা পাড়িলেন। সতীশচন্দ্রকে আনাইয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সতীশ শ্রীশচন্দ্রের কথা কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সুখের কথার আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া, সূর্য্যমুখী কমলকে স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সতীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উভয়কে বিদায় দিবার কালীন সূর্য্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসম্বরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয়গুণে গুণবান্ হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

সূর্য্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি হইতেছে?—কি বল না?"

সূ। কিছু না।

কম। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন সচ্ছন্দ চিত্তে শয়ন মন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন। পত্র খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল না,—তাহা করতলে বিমর্দ্দিত

করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে যাইবার সময়ে বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?" সতীশ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশীর্ব্বাদ পত্র।

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্র খানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ;—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সংকল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখন পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপনি গৃহত্যাগ করিয়া যাইব। কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।

কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই একদিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর এক বার দেখিয়া যাইব,

সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।

"আর যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এদেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি লইলে সঙ্গে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী, আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম, আবার লিখিলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমনি করিয়া আমার এ সম্বাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর

রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখন তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখন করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল; যত দিন না মাটীতে এদেহ মিশায়, ততদিন থাকিবে। কেননা তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্ব-ত্যাগিনী হইতেছি।

"তোমারও কাছে জন্মের মত বিদায় লইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, যে তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক। তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি, যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃ শেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষবৃক্ষ কি ?

যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফল-ভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহ প্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই

এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষ কামক্রোধাদির অস্পৃর্শ্য। জ্ঞানিব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে, সেই সকল রিপু কর্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে২ প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন, এবং সংযত করিয়া থাকেন; সেই ব্যক্তি মহাত্মা। কেহবা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; এক বার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব, ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম, দেখিতে অতিরমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্র বিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগ শোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্ত সংযম পক্ষে আবশ্যক, প্রথমতঃ চিত্তসংযমের প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের সক্ষমতা। ইহার মধ্যে ক্ষমতা প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্ত সংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না; অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখ ভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখন হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্তরূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগ শরীর; সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা; সুশীল চরিত্র; স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী; এ সকল একজনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এসকলই ঘটিয়াছিল। প্রধান পক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ম্বদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী, স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থিরসংকল্প। পিতা মাতা

বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান্; অনুগতের প্রতিপালক; শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ; কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাম্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ; —নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান; বিদেশে যশঃ; অনুগত ভৃত্য প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখন এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহার যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধ লোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখন লোভে পড়েন নাই, কেন না কখন কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্য তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; অগ্রচ পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্ত ও গুরুতর আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সম্বাদ গৃহ মধ্যে রাষ্ট হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়া-

তাড়ি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, কমলমণি চারিদিকে লোক পাঠাইলেন। বড়২ দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছুটিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, তুলাভরা ফরাশীর ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মস্‌২ করিয়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খানসামারা গামছা কাঁধে, গোট কাঁকালে মা ঠাকুরাণীকে ফিরাইতে চলিল। কতকগুলি আত্মীয় লোক গাড়ি লইয়া বড় রাস্তায় গেল। গ্রামস্থ মাঠে ঘাটে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল, কোথাও বা গাছ তলায় কমিটি করিয়া তামাকু পোড়াইতে লাগিল। ভদ্র লোকেরাও বারোইয়ারির আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায় কচকচি ঠাকুরের টোলে, এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী ছাগী স্নানের ঘাট গুলাকে ছোট আদালত করিয়া তুলিল। বালক মহলে ঘোর পর্ব্বাহ বাঁধিয়া গেল; অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটি হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখন পথ হাটেন নাই—কত দূর যাইবেন? এক পোওয়া আধক্রোশ পথ গিয়া কোথায় বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া২ বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সম্বাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন। এই রূপে দিনমান গেল।

বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য। সূর্য্যমুখী কখন পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন নাই। কতদূরে যাইবেন? বাটী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্র বাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে২ সেই খানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল। চিনিয়া বলিল;—"আজ্ঞে, আসুন!"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে, আসুন! বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" সূর্যমুখী তখন ক্রোধ ভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সম্বাদ দিল। নগেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্য্যমুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে তল্লাস করিলেন; কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্য্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু সূর্য্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সেও সন্ধানে ছিল। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, তুমি কি আমাদের মা ঠাকুরাণী গা?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না, বাছা।"

বুড়ী বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের মা ঠাকুরাণী।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমাদের মাঠাকুরাণী কে গা?"

বুড়ী বলিল, "বাবুদের বাড়ীর বউ গা।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার গায়ে কি সোণা দানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?"

বুড়ী ভাবিল, "সত্যি ত বটে।"

সে তখন কাঠ কুড়াইতে২ অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল; রাত্রেও কোন ফল লাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য্য সিদ্ধ হইল না—অথচ অনুন্ধানের ত্রুটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারীরা প্রায় কেহই সূর্য্যমুখীকে চিনিত না—তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরিব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমক হালাল হিন্দুস্থানীরা "মা ঠাকুরাণী" বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পালকী বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনা ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

শ্রীশচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কমলমণি, গোবিন্দপুরে থাকিয়া, অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সকল সুখেরই সীমা আছে।

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন,

এ সুখের সীমা নাই, পরিমাণ নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, "সূর্য্যমুখী আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিলেন—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।" দেখিলেন, সুখের সীমা আছে।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই—অথচ দুই জনেই নীরব—সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

কিন্তু সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি ইহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্ব্বদা মনে ভাবিতেন, "কি করিলে, আবার যেমন ছিল, তেমনি হয়।" আজিকার দিন, এই সময়, কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করিলে, যেমন ছিল তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র কিছু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখন আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে, সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে অমার অন্তর্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।"

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন, কিন্তু—নগেন্দ্রের ইহা বলাতে

কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।" কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত রহিলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন,

"কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?" কুন্দ কহিলেন, "না।"

ন। কেবল একটি ছোট্টো "না" বলিয়া আবার চুপ করিলে। তুমি কি আমায় আর ভাল বাস না?

কু। বাসি বই কি?

ন। 'বাসি বই কি?' এ যে বালক ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভাল বাসিতে না।

কু। বরাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্য-মুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন না। আর কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভাল বাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হার সহিবে কেন?—লোহার শিকলই ভাল।"

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে২ উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিলনা যে তাহার কাছে রোদন করেন। কমলমণির আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী, আপনাকে এবিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখা-ইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া, স্নেহ-

ময়ী, কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। যে দিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময়, কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া, তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি, কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনআপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে," অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষবৃক্ষের ফল।

হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা, সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ, সকলেই মাটী খোঁড়ে, কহিনূর এক জনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কহিনূর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণিত করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ

হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমরও মরিবার জন্য এ. মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়া ছিলাম? আমি কি তাহাকে ভাল বাসিতাম? ভাল বাসিতাম বৈ কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়া ছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভাল বাসা। নহিলে আজি পনের দিবস মাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি কি তাহাকে ভাল বাসিতাম?" ভাল বাসিতাম কেন? এখন ও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু আজি আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি

হরদেব ঘোষালের উত্তর।

আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে—এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল চোকের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।

তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমত গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্য আর তিরস্কার করিব না—কেননা তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে তাঁহার অপনোদন বড় কঠিন। মনের অনেক গুলিন ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্র-

স্তত হই, তাহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তত হই," অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্য কবিরা মদন শরজ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার, বসন্ত সহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্ম মৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহ মাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বর প্রেরিতা, ইহার দ্বারাও সংসারের ইষ্ট সাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি;—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকর্ষিত এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গ লিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মায়। ইহার ফল, সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্ম বিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়; সেক্ষপায়র, বাল্মীকি, মাদাম্ দেস্তাল্ ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা, আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গ ফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্ম বিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়' অন্য ভাল বাসারও মূল এইরূপ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক।

নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন কখন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন২ হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে,—কেননা উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্রই জন্মে; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গফল বদ্ধমূল হইলে রূপ থাকা না থাকা সমান, রূপবান্ ও কুৎসিতের প্রতি স্নেহ সমান হয়। কুরূপ স্বামী বা কুরূপ স্ত্রীর প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণ স্থল।

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয়, যে অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকাল স্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ীপ্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তোমাকে তিরস্কার করি না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা কর।

তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রা-

দিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজমোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভাল বাসেন। ভাল বাসায় কখন অযত্ন করিবে না। কেননা ভাল বাসাতেই মানুষের এক মাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভাল বাসাই মনুষ্য জাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্য মাত্রে পরস্পরে ভাল বাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবেনা। ইতি।

নগেন্দ্র নাথের প্রত্যুত্তর।

তোমার পত্র পাইয়া, মানসিক ক্লেশের কারণ এ পর্য্যন্ত উত্তর দিই নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে সৎপরামর্শ, তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মনঃ স্থির করিতে পারি না। এক মাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সম্বাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার কল্পনা করিয়াছি। আমিও গৃহ ত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে,—আমি কি করিব? আমি চলিলাম, শীঘ্র তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি।

নগেন্দ্র নাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেই রূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং এ আখ্যায়িকার লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একাই দত্তদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন আর হীরাদাসী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপ সমুজ্জ্বল, বহুলোক সমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর, অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সেই রূপ আঁধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া এক দিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটীতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটী পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী, ভগ্ন পুতুলের ন্যায়, নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরী মধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বন দাহ কালীন শাবক সহিত পক্ষীনীড় দগ্ধ হইলে, পক্ষিণী আহার লইয়া আসিয়া দেখে, বৃক্ষ নাই, (বাসানাই,) (শাবক নাই;) তখন বিহঙ্গিনী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে২ সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেই রূপ সূর্য্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! যেমত অনন্ত সাগরে অতল জলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপণীয়া হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ।

কার্পাসবস্ত্র মধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রর নিরুপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে২ দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্ম্মভীতি, এবং লোকলজ্জা, প্রণয় বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্ত সংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী। এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্ম্ম ভীতা না হইয়াও এ পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতা প্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ, অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায় স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্ব্বার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে, এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিক দংশন স্বরূপ জালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র যখন, কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

হীরার পুনর্ব্বার দাস্যবৃত্তি স্বীকার করার আর একটী কারণ ছিল। হীরা পূর্ব্বে অর্থাদি কামনায়, কুন্দকে নগেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া স্বীয় বশীভূতা করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের হস্তগত হইবে; কুন্দের হস্তগত অর্থ হীরার হইবে। এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহিণী হইল। অর্থ সম্বন্ধে কুন্দের কোন বিশেষ আধিপত্য

জন্মিল না, কিন্তু এখন সে কথা হীরারও মনে স্থান পাইল না। হীরার অর্থে আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দহইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।

হীরা, আপনার নিষ্ফল প্রণয় যন্ত্রণা, সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশ পরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীকে স্মরণে হীরার মহাভয় সঞ্চার হইল। হীরা হরীদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গলকামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপরে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গল চিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।

হীরাদাসী, কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল, যে হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, এবং তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্ত স্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখন তাহাকে কিছু বলিত না। কুন্দ শীতল প্রকৃতি, হীরা উগ্র প্রকৃতি। এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল। পুরবাসিনীরা কখন২ কুন্দের যন্ত্রণা দেখিয়া হীরাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাঙ্ময়ী হীরার নিকট তাল

ফাঁদিতে পারিত না। দেওয়ান্‌জী, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া, হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।" শুনিয়া হীরা রোষবিস্ফারিত লোচনে দেওয়ান্‌জীকে কহিল, "তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছেন। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমার সেই ক্ষমতা।" শুনিয়া দেওয়ান্‌জী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্য্যমুখী নহিলে কেহ হীরাকে শাসিত করিতে পারিত না।

একদিন, নগেন্দ্র বিদেশে যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরারই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে; উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমালা প্রতিফলিত হইতেছে। লতাপল্লবরন্ধ্র মধ্যহইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেত প্রস্তরময় হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়াছে এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তাড়িত স্বচ্ছজলের উপর নাচিতেছে। উদ্যানপুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। পুষ্পগন্ধে সুরভি বায়ু যেমন উন্মাদকর, প্রকৃতিস্থ কোন সামগ্রীই তদ্রূপ নহে। এমত সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপ মধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র। অদ্য দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন, নিজবেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে, আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যে খানে হীরা আছে, সে খানে আমার

ভয় কি?" এই বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছেন? যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা ত পাইয়াছি। আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপটালাপে প্রতারিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল, "আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। যাহা হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া মনের তৃপ্তি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন। এখানে অনেক বিঘ্ন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় যাইবে?"

হীরা কহিল, "যেখানে কোন ভয় নাই। আপনার সেই নিকুঞ্জ বনে চলুন।"

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করিও না।

হী। যদি আপনার জন্য ভয় না থাকে, আমার জন্য ভয় করিতে হয়। আমাকে আপনার কাছে এ অবস্থায় কেহ দেখিলে, আমার দশা কি হইবে?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "তবে চল। তোমাদের নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না?"

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি যে ঈর্ষ্যানলজ্বালিত কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অস্পষ্টালোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা কহিল,—

"তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে?"

দেবেন্দ্র বিনীত ভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই বলিয়া হীরা লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইল। কিয়দ্দূরে আসিয়া এক বৃক্ষান্তরালে বসিল, এবং তখন তাহার কষ্টসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে কহিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুর মধ্যদিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া, দূর হইতে কালো২ গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিলেন। তেওয়ারি গোষ্ঠী কিছু-দূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবানগণ কর্ত্তৃক "শ্বশুরা" "শালা" প্রভৃতি প্রিয় সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এমত আমরা শুনিয়াছি। এবং তাঁহার ভৃত্য একদিন তাঁহার প্রসাদি ব্রাণ্ডি খাইয়া পরদিবস আপন উপপত্নীর নিকট গল্প করিয়াছিল যে, "আজি বাবুকে তেল মাখাইবার সময়ে দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা কালশিরা দাগ্।"

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থির কল্প হইলেন। প্রথম, হীরা থাকিতে তিনি আর দত্ত বাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হী-রাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরু-তর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হ-ইল। হীরা এমত গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া

শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে, পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পথিপার্শ্বে।

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছেল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া২ কে পথ চলে? এক জন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দন রেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র২ কেশ গুলি কতক২ শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে২ চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতেই আবার পথে রাত্র হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেননা তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ সুপথ সব সমান।

রাত্র অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে—সেই বৃক্ষ শিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু২ বৃষ্টি পড়িতেছে।

একং বার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুতালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মাগো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দ সূচক দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক —কিন্তু তথাপি মনুষ্য কণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘনং বিদ্যুৎ হ-ইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে পথিক দেখিলেন, পথ পার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মানুষ? পথিক তাহাই বিবে-চনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করি-লেন। দ্বিতীয়বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। ত-খন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—একবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্ত্ত জন্য কর্ণে প্রবেশ ক-রিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রচার করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্য দেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরো-দেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন। "দুর্গে! এযে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন স্ত্রীলোকটীকে, দুই হস্তদ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ

প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে; তথাপি শিশু সন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে ক-রিয়া এই দুর্গমপথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখন শারীরিক বলের অভাব জা-নিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণ কুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসংজ্ঞা স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীর মধ্য হইতে এক জন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আস্‌চি। শীঘ্র দোর খোল—আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তা-হাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে২ স্ত্রীলোকটীকে গৃহমধ্যে মাটীর উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটী প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণ-যুক্ত। সময় বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন—এবং শত স্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট। এখন সে চক্ষু নি-মিলিত। নিঃশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হ-ইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমনি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমনি ব্রহ্মচারীর আদেশ মত, তাহার আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্কবস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্কবস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু২ কোরে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমনির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া, অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটীকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষুরুন্মীলন করিল। দেখিয়া, হরমনি জিজ্ঞাসা করিল,—

"মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধা স্ত্রী কহিল, "আমি কোথা?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেকদূর।"

হরমনি। তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি কি সধবা?

পীড়িতা ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমনি অপ্রতিভ হইল।

হর। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?"

অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

———

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

আশা পথে।

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইহার কাশ রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাংঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটা রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপীশাচ ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন,

"ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশের আবশ্যক নাই।"

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম। আজ যদি তোমার কাযে নিযুক্ত না থাকিতাম, তবে তোমার মত অন্য কাহারও কাযে থাকিতাম।

সূর্য্য। তবে, আমাকে রাখিয়া, আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন—আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রে যখন পথে পড়িয়াছিলাম—তখন নিতান্ত আশা করিতেছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না—কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যা তুল্য পাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এই জন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যতবার মরিবার কথা হইল, ততবার তোমার চক্ষে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখ নিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিব বলিয়াই, হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথা বার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্র ঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এ সময় কেন করি? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়—কেবল, মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম

না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে এক বার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।”

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, “তোমার স্বামী কোথায়? এখন তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি সম্বাদ দিলে এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সম্বাদ দিই।”

সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, “তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি তত দিন বাঁচিব কি?”

ব্র। কতদূর সে?

সূ। হরিপুর জেলা।

ব্র। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া আসিলেন। এবং সূর্য্যমুখীর কথা মত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন।—

“আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনি কে, তাহাও আমি জানি না। কেবল এই মাত্র জানি, যে শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী আপনার ভার্য্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে শঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাটীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সম্বাদ দিবার জন্য আপনাকে এ পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকালে এক বার আপনাকে দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার

অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি ইহাকে মাতৃ সম্বোধন করি। পুত্র স্বরূপ তাঁহার অনুমতি ক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে, তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুর খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

আসিতে হয় ত, শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। ইতি

"আশীর্ব্বাদ শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।"

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নামে শিরোনামা দিব।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "হরমণি আসিলে বলিব।"

হরমণি আসিলে নগেন্দ্র নাথ দত্তের নামে শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্র খানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্য্যমুখী সজলনয়নে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্র খানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাই না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন

গোবিন্দপুরে পঁহুছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দরওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল, যে আমি যখন যেখানে পঁহুছিব, তখন সেই খান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেই খানে আমার নামের পত্র গুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতি পূর্ব্বেই নগেন্দ্র পাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকাপথে কাশী যাত্রা করিলাম। কাশী পঁহুছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।" দেওয়ান সেই সম্বাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র, বাক্স মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথা সময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সম্বাদ দিলেন। তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া, অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া, কাতরে কহিলেন, "জগদীশ্বর! মুহূর্ত্ত জন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পঁহুছিল;—মুহূর্ত্ত জন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল। কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন "আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া, অচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাতে করিলেন। ভুবনসুন্দরি বরাণসি, কোন্ সুখিজন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্ত লোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র২ নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া

যে দিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র!—অনন্ত তেজে অনন্তকাল হইতে জলিতেছে—অবিরত জলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরঙ্গিণী হৃদয়; তীরে, সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র২ আলোক জলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এই রূপ আলোক রাজী শোভিত অনন্তশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত আকাশ, নগর, নদী,—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুদিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহার আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পরে পঁহুছিয়াছে—এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত।

যে দিন পাঁড়ে গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, সে দিন হীরা মনে২ বড় হাসি হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে২ ভাবিতে লাগিল, "আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই। তিনি নাজানি, মনে২ আমার উপর কত রাগ করিয়াছেন। একে ত আমি তাঁহার মনের মধ্যে স্থান পাই না; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।"

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কাম সিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতীর দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা, দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না

—ভূতপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন উর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জালপাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতব বাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপধায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিকে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধি লোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া, তানপুরা লইলেন। এবং সুরাপান সমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রেমবিদ্রাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব্বসংসারসুন্দর, সর্ব্বার্থসার, রমণীর সর্ব্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপুরা রাখিয়া, সযত্নে আপন বসনাগ্রভাগে হীরার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন। হীরার শরীর পুলককণ্টকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্য পরিহাসসংযুক্ত সরস সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখন বা এরূপ প্রকৃত প্রণয়ীর অনুরূপ, স্নেহসিক্ত, অস্পষ্টালঙ্কারবচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানহীনা, অপরিমার্জ্জিত-বাগ্‌বুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্গসুখ। হীরা ত কখন এমন কথা শুনে নাই।

হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গ পরিমার্জ্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল—প্রেম কাহাকে বলে দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গত করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল—কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের মুখে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমানুষচিত্তসম্পন্ন মনে করিল—স্বয়ং আপাদ কবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল। তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথম বসন্তপ্রেরিত এক মাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুণ২ স্বরে, সঙ্গীতোদ্যম করিলেন। হীরা দুর্দ্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্ত্তি প্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাকে গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুরারাগরঞ্জিত কমল নেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া, প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। চিত্তস্ফূর্ত্তি বশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চস্বর উঠিল। হীরা যাহা গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য—প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া, পাপান্তঃকরণ দুই জনে, পাপাভিলাষবশীভূত হইয়া, চিরপাপ রূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্ত সংযত করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও, অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল।

আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয় বেধকারী অনুরাগ কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তিহেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্ত সংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফল ভোগ করিল না।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যমুখীর সম্বাদ।

বর্ষাকাল গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইয়াছে। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে২ ধূমাকার হয়। এমত কালে কার্ত্তিক মাসের একদিন প্রাতঃকালে মধুপুরে রাস্তার উপরে এক খানা পালকি আসিল। পল্লীগ্রামে পালকি দেখিয়া দেশের ছেলে খেলা ফেলে পালকির ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল—অবাক হইয়া পালকি দেখিতে লাগিল। বউ গুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ্ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর আর স্ত্রী লোকেরা ফেল২ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাসারা কার্ত্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পালকি দেখিতে লাগিল। গ্রামের

মণ্ডল মাতব্বর লোকে অমনি কমিটীতে বসিয়া গেল। পালকির ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পালকির ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল—কেন না তাঁহার পেণ্টালুন পরা, টুপি মাথায় ছিল। কেহ ভাবিল, দারোগা; কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন একব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্র শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনি মামলার সুরতহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলে মানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্ট লোকের বাড়ীতে গেলেন। সেগৃহের স্বামী রামকৃষ্ণরায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণরায়, একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সম্বাদ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ন হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ, তিনি একস্থানে স্থায়ী নহেন; সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন, তাহা কেহ জানে?

রামকৃষ্ণ। তাঁহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন এখান হতে গিয়াছেন?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে গিয়াছেন।

নগে। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায়, আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?

রামকৃষ্ণ। হরমণির ঘর পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনার কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে?"

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহার ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। কেহ২ এমনও বলে যে, সে আপনার ঘরে আপনি আগুন দিয়া পালাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নস্বর হইয়া কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রী-লোক থাকিত?"

রামকৃষ্ণরায় কহিলেন, "না; কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িত হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ী রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রী-লোকটি কাশরোগগ্রস্ত ছিল—আমিই তাঁহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলাম— এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে২ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময় কি—?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময় হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।"

নগেন্দ্র নাথ চৌকি হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভাল বাসিতে চাহে? সে আপনার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া দগ্ধ করুক। কেন, বিধাতঃ! এসংসার সুখের কর নাই? তুমি ইচ্ছাময়; ইচ্ছা করিলে সুখের সংসার সৃজিতে পারিতে। সংসারে এত দুঃখ কেন?

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

এত দিনে সব ফুরাইল।

এত দিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্রদত্ত মধুপুর হইতে পালকিতে উঠিলেন, তখন এইকথা মনে২ বলিলেন, "আমার এত দিনে সব ফুরাইল।"

কি ফুরাইল, সুখ? তাত যে দিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যত দিন মানুষের আশা থাকে, তত দিন কিছুই ফুরায় না; আশা ফুরাইলেই সব ফুরাইল।

নগেন্দ্রের আজ আশা ফুরাইল। সেই জন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয় আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জমীদারী, ভদ্রাসন বাড়ী, এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দান পত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখা পড়া উকীলের বাড়ী নহিলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছু মাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর তিনি জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। বিষয় আশয়ের আয় ব্যয়ের কাগজপত্র সকল শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্য্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে শুইয়া এক বার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কার গুলিন লইয়া আসিবেন। সে গুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেই গুলি দেখিতে২ মরিবেন। এই সকল আবশ্যকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশ পর্য্যটন করিবেন। আর যত দিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিন যাপন করিবেন।

শিবিকারোহণে এই রূপ ভাবিতে২ নগেন্দ্র চলিলেন। শিবিকাদ্বার মুক্ত, রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সেরাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্ট পদার্থ মাত্রই চক্ষুঃশূল বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংসা। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতি-

বিস্মিত হইয়া হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজ সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল! পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্য পরিহাসে রত; পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসারস্রোতঃ তেমনি অপ্রতিহত! জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকা সমেত গ্রাস করিল না?

নগেন্দ্র ভবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ! তাঁহার তেত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফু-রাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে২ মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মান, এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়া অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা মাতা ত্রুটি করেন নাই—তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও প্রকৃতি তাঁহাকে অমিত হস্তে দিয়াছেন। ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য অশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে, ধন সম্পদ মান, রূপ যৌবন বিদ্যা বুদ্ধি, সব দিলে, তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন, "এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে, যে আমার অপেক্ষা

সুখী নয়? আমা হতে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে। আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে, সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি আমার কেবল স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহেলক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণেসঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?"

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে, যাইতেছেন, সূর্য্যমুখী, পথ হাঁটিয়া২, পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ২ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেই খানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিলেন।

তখন মনে করিলেন, "ইহ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখ-

ভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, দাস, দাসী, বন্ধু, বান্ধবের আর কোন সংশ্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমিও সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে২ অনাথিনী স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া তাহার উপকার করিব। যে অর্থ নিজ ব্যয়ার্থ রাখিলাম, সে অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ, আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যে ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?" তখন চক্ষে হস্তাবরণ করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া, নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না।

রাত্রি প্রহরেকের সময়ে শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমত সময়—পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তবাহিত কানবাস ব্যাগ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ রাখিয়া, নীরবে এক খানা চেয়ারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন, মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হই-

লেন; কি জিজ্ঞাসা করিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন; এবং পত্র পাইয়া, মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশীহইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিলেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন, এবং তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—

"ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্র এই মাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?"

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সন্ধান পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "স্বর্গে।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন! ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্য্যমুখী কোথাও নাই" এ কথা সহ্য হয় না —"সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন"—এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। এখন পরের কথা বিষরোধ হইবে। পরের সংসর্গও বিষ। এই বুঝিয়া, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের

কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; মনেং করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন।

কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আলুলায়িত কুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধুলিধূসরা, নীরবে রোদনপরায়ণা দেখিয়া, প্রথমে নীরবে, নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি, সতীশের অঙ্গে হস্ত প্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া, মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল। সে বালকহৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন, কে সে বালকরোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?

শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন,

"উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণরায়ের কাছে যাহাং শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহাং কল্পনা করিয়াছিলেন; তাহা সকল বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য। কেননা গত কল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

নগে। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?

শ্রী। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধান করিতে স্বয়ং গোবিন্দপুর আসিয়াছিলেন। গোবিন্দপুরেও তোমাকে পাইলেন না, কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া, এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া, তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সন্ধানার্থ পুনশ্চ গোবিন্দপুর গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সম্বাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সম্বাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশ্ব দিন আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কাল গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নগে। আমি কালি রাণীগঞ্জে ছিলাম না। সূর্য্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?

শ্রীশ। সে সকল কাল বলিব।

নগে। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশ বৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল।

তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা, পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও

প্রায়ারোগ্যলাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন, —সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে২ নগেন্দ্র রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাগলের মত বেড়াইতে লাগিলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতোমধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল—আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে? তখন পুনর্ব্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন? তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি?"

শ্রী। আজি আর সে সকল কথায় কায কি? আজ শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।

নগেন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া মহাপরুষ কণ্ঠে কহিলেন, "বল।" শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন; বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত, তাঁহার মুখ কালিময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল; শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গোবিন্দপুর হইতে সূর্য্যমুখী স্থল পথে অল্প২ করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিকে আসিয়াছিলেন।"

নগে। প্রত্যহ কত পথ চলিতেন?

শ্রীশ। এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ।

নগে। তিনি ত একটা পয়সাও লইয়া বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইত কিসে?

শ্রী। কোন দিন উপবাস—কোন দিন ভিক্ষা—তুমি পাগল !!

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেন না নগেন্দ্র আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠরোধ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, " মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, " বল।"

শ্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদিতনয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়া আছেন; চারি দিক হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারিদিকে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে, দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে, তাঁহার সিংহাসন চন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে; চারিপার্শ্বে শত২ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনা বিধান করিলেন। চেতনা প্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, " সূর্য্যমুখি! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি ?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরব হইয়া বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, " বল!"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, " আর কি বলিব ?"

নগেন্দ্র। বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সূর্য্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট পান নাই। এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন তিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন। এক দিন নদীকূলে সূর্য্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্য্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও কাশী যাইবেন।

নগে। সে ব্রাহ্মণের নাম কি, ও বাটী কোথায়?

নগেন্দ্র মনে২ প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন রূপে তাহার সন্ধান করিয়া প্রত্যুপকার করিবেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?"

শ্রী। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্য্যমুখী বর্হি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক্‌ট্রেনে গিয়াছিলেন; এ পর্য্যন্ত হাটিয়া ক্লেশ পান নাই।

ন। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিল?

শ্রীশ। না; সূর্য্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কতদিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন? তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষুর জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠ লগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁদে মাথা রাখিয়া, রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের

বাটী আসিয়া এপর্য্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই—তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধ শোকপ্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। ইহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকের রোদন নাই, সে যমের দূত!

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এ সব কথায় আজ আর আবশ্যক নাই।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বর্হি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথ হাঁটার পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্র বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয়ে, আর মনের ক্লেশে সূর্য্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্যে অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ; তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই?

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

হীরার বিষবৃক্ষের ফল।

হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চির-কষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু একদিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এককড়া কানা কড়ি। কেন না দেবেন্দ্রের প্রেম, বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোন২ কৃপণ অথচ যশোলিপ্সু ব্যক্তি বহুকালাবধি প্রাণপণে সঞ্চিতার্থ রক্ষা করিয়া, পুত্রোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে একদিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, হীরা তেমনি এত দিন যত্নে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, একদিনের সুখের জন্য তাহা নষ্ট করিয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপণের ন্যায় চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্ত্তৃক অল্পোপভুক্ত অপক্ক চূত ফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে—সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যে রূপ অপমানিত ও মর্ম্ম পীড়িত হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, শেষ সাক্ষাৎ দিবসে, হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না," তখন দেবেন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এতদূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন

গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।”

হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক ঘূর্ণন স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রুকুটি কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া, যেন শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা, পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকেই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপ তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুত হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে একজন চণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণ সংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষবড়ি প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ্জ বিষ, খনিজবিষ, সর্পবিষাদি নানাপ্রকার সদ্য প্রাণাপহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, “একটা শিয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সেই শিয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব— সে আজি হাঁড়ি খাইতে আসিলে বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে; সদ্য প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার?”

চণ্ডাল শিয়ালের গল্প বিশ্বাস করিল না। বলিল, “আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে; কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে

পারি না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিষে ধরিবে।"

হীরা কহিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্ট দেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।"

চণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণ বিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বিষ বিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চণ্ডালকে দিল। চণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, "দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল।"

চণ্ডাল কহিল, "মা! আমি তোমাকে চিনিও না।" হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেক রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া, মনে২ কহিল, "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের একজনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয়, মরিব।"

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

হীরার আয়ি।

"হীরার আয়ি বুড়ি।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়িং।
দাঁতে ভাঙ্গে নুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড়বুড়ি।"

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়িং যাইতেছিল, পশ্চাৎ২ বালকের পাল, এই অপূর্ব্ব কবিতাটি পাঠ করিতে২, করতালি দিতে২, এবং নাচিতে২ চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে কোন বিশেষ নিন্দার কথা ছিল কি না, সন্দেহ—কিন্তু হীরার আয়ি বিলক্ষণ কোপাবিষ্ট হইয়াছিল। সে বালকদিগকে যমের বাড়ী যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছিল—এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অন্যায় ব্যবস্থা করিতেছিল। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আয়ি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বারবানদিগের ভ্রমরকৃষ্ট শ্মশ্রুরাজি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইল। পলায়ন কালে কোন বালক বলিল;—

"রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে,
চোর এলে কোথায় পালাবে?"

কেহ বলিল;—

"রাম সিং পাঁড়ে,
বেড়ায় লাঠী ঘাড়ে,

চোর দেখলে দৌড়মারে পুকুরের পাড়ে।"

কেহ বলিল;—

"লালচাঁদ সিং
নাচে তিড়িং মিড়িং
ডালরুটির যম, কিন্তুকাজে ঘোড়ার ডিম।"

বালকেরা দ্বারবানগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ অভিধান ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্২ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তার খানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া চিনিয়া, বুড়ী কহিল;—

"হাঁ বাবা—ডাক্তার বাবা কোথা গা?" ডাক্তার কহিলেন, "আমিইত ডাক্তার" বুড়ী কহিল, "আর বাবা, চোকে দেখতে পাইনে—বয়স হইল পাঁচ সাত গণ্ডা, কি এক পোনই হয়— আমার দুঃখের কথা বলিব কি—একটি বেটা ছিল তা যমকে দিলাম—এখন একটি নাতিনী ছিল, তারও—" বলিয়া বুড়ি— হাঁউ—মাউ—খাঁউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে তোর?"

বুড়ী সে কথার উত্তর না দিয়া আপনার জীবন চরিত আ- খ্যাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং অনেক কাঁদা কাটার পর তাহা সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইল —"এখন তুই চাহিস কি? তোর কি হইয়াছে?"

বুড়ী তখন পুনর্ব্বার আপন জীবন চরিতের অপূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাতার, ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবন চরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার

বহু কষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন—কেননা তাহাতে আত্মপরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহুল্য।

মর্ম্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে। রোগ বাতিক। হীরা গর্ভে থাকা কালে, তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—তাহাতে কখন মাতৃব্যাধির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু আজি কালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখন কখন একা হাসে—একা কাঁদে, কখন বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচে। কখন চীৎকার করে। কখন মূর্চ্ছা যায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধি চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমার নাতিনীর হিষ্টিরিয়া হইয়াছে।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা! ইষ্টিরসের ঔষধ নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "ঔষধ আছে বৈকি। উহাকে খুব গরমে রাখিস, আর এই কাষ্টর-ওয়েল টুকু লইয়া যা—কাল প্রাতে খাওয়াইস্। পরে অন্য ঔষধ দিব।"

বুড়ী কাষ্টর-ওয়েলের সিসি হাতে, লাঠি ঠক২ করিয়া চলিল। পথে এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরের আয়ি, তোমার হাতে ও কি?"

হীরার আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়াছে। তা হাগা? কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—"তা হবেও বা। কেষ্টইত সকলের ইষ্টি। ত তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পারে। আচ্ছা, হীরের আয়ি, তোর নাতিনীর এত

রস হয়েছে কোথা থেকে?" হীরের আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়স দোষে অমন হয়।"

প্রতিবাসিনী কহিল, "একটু কৈলে বাচুরের চোনা খাইয়ে দিও। শুনিয়াছি, তাতে বড় রস পরিপাক পায়।"

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীরার সম্মুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর্! আগুন কেন?"

বুড়ী বলিল, "ডাক্তার তোকে গরম কর্‌তে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারপুরী—অন্ধকার জীবন।

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারি বাড়ীতে আমলারা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায়? কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধূলার রাশি, কার্ণিসে২ পায়রার বাসা, কড়িতে২ চড়ই। বাগানে শুকনা পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে শিয়ালা, ফুলবাগানে জঙ্গল, ভাণ্ডার ঘরে ইন্দুর। জিনিসপত্র সব ঘেরা টোপে ঢাকা। অনেকেতেই ছাতা ধরেছে। অনেক ইন্দুরে কেটেছে, ছুঁচা বিছা বাদুড় চামচিকে অন্ধকারেই দিবারাত্র বেড়াইতেছে। সূর্য্যমুখীর পোষা পাখী গুলাকে প্রায় বিড়ালে ভক্ষণ করিয়াছে। কোথাও২ উচ্ছিষ্টাবশেষ পাখাগুলি পড়িয়া আছে। হাঁস গুলা শৃগালে মারিয়াছে। ময়ূর গুলা বুনো হইয়া গিয়াছে। গোরু গুলার হাড় উঠি-

য়াছে—আর দুধ দেয় না। নগেন্দ্রের কুক্কুর গুলার স্ফূর্ত্তি নাই—খেলা নাই, ডাক নাই—বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে—কোনটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পালাইয়া গিয়াছে। ঘোড়া গুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আস্তাবলে যেখানে সেখানে খড়কুটা; শুকনা পাতা, ঘাস, ধূলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস দানা কখন পায় কখন পায় না। সহিষেরা প্রায় আস্তাবলমুখা হয় না; উপপত্নীর গৃহেই থাকে। অট্টালিকার কোথা আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট খসিয়াছে; কোথাও সাসী, কোথাও খড়খড়ি, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। মেটিঙ্গের উপর বৃষ্টির জল, দেয়ালের পেণ্টের উপর বসুধারা, বুককেশের উপর কুমীরকার বাসা, ঝাড়ের ফানুসের উপর চড়ইয়ের বাসার খড়কুটা। গৃহে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মীবিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মী ছাড়া হয়।

যে উদ্যানে মালী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখন একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজনে খাইত পরিত, কুন্দও তাই। যদি কেহ তাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত, আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক দুড়২ করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজিকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণওছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেওয়ানকে যে পত্র গুলিন লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না—সেই গুলিন পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্র গুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম শুনিলেই কুন্দের

মুখ শুখাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্র গুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক, সূর্য্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভাল বাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয় খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা কুন্দের নিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত সে হৃদয়ে আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। তার পর—এখন কোথায় সে চাঁদ? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্র দিন ভাবে, রাত্র দিন কাঁদে। ভাল নগেন্দ্র নাই ভাল বাসুন—তাকে ভাল বাসিবেন কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন, কুন্দই এই বিপত্তির মূল; সকলেই ভাবে, কুন্দই অনর্থের মূল। কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থে মূল?

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে।

আবার কুন্দ ভাবিত, "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমাহতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালিনী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না

কেন? এখনও মরি না কেন?" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যু সম্বাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু২ মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাগমন।

কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপ্ত হইল। দান পত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাতনাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজেষ্ট্রি হইবে এই কারণে দান পত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুর গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দান পত্রাদির ব্যবস্থা, এবং পদব্রজে গমন, ইত্যাদি কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিস্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপন্থায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রী ছাড়া হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসা বাদে সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ; মুখ দেখিতেন না।

কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন—নগেন্দ্র আসিতেছেন, সম্বাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর মৃত্যু সম্বাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে২ হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে।" কিন্তু কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতিন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সতিনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে বলতেছ, "মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে"—তোমার সতিন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তাহলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম২ কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন—তার পরে ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে—কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না, তবে কেন এদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্য্যমুখীকে ভুলিব না; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাস্‌ব না?" এই ভাবিয়া কলমণি রোদন ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাই বোলে দাদা বাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বট পত্রে শোবেন?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অমনি শ্রীশচন্দ্র, রাজ মজুর, ফরাশ, মালী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেখানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। ঐ দিকে কম-

লমণির দৌরাত্ম্যে ছুঁচা বাদুড় চামচিকে মহলে বড় কিচি মিচি পড়িয়া গেল; পায়রা গুলা "বকম২" করিয়া এ কার্ণিশ ও কা-কার্ণিশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, চড়ই গুলা পলাইতে ব্যাকুল —যেখানে সাসী বন্ধ, সেখানে দ্বার খোলা মনে করিয়া, ঠোঁঠে কাঁচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারিকারা ঝাঁটা হাতে জনে২ দিকে২ দিগ্‌বিজয়ে ছুটিল। অচিরাৎ অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী, প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগে-ন্দ্রের সম্পূর্ণ শোকপ্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হই-য়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; কিন্তু অধৈর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে, পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল। নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

স্তিমিত প্রদীপে।

নগেন্দ্রনাথের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যাপ্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে, পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে। সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির— এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কক্ষটী প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা পল্লব ফল পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র২ বিহঙ্গম সকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। এক পাশে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত হস্তিদন্তরচিত কারু কার্য্য বিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর এক পাশে বিচিত্রবস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয় খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতি নহে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরাজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। এক খানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বত-শিখরে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চারণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বাম প্রকোষ্ঠার্পিত হেমবেত্র —মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন।

কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যান ভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে২ বসন্তের উদয়। অগ্রে, বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী, মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণামিজন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিত। মস্তক নমিত হওয়াতে, অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে; বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে; দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছে। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্য মার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা, নিম্নে, পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমান চতুষ্পার্শ্বে নানা বর্ণের মেঘ,—নীল, লোহিত, শ্বেত,—ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে, আবার বিশাল নীল সমূদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্যকরে তরঙ্গ সকল হীরক রাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতি দূরে—"সৌধকিরিটিনী লঙ্কা"—তাহার প্রাসাদাবলির স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে, শ্যাম শোভাময়ী "তমাল তালীবনরাজিনীলা" সমূদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবীসেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে

তাহাদিগের পতাকা শ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যা-
ইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন; অ-
শ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘ সকল চূর্ণ করিতেছে;
সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অ-
র্জ্জুনের প্রতি বক্র দৃষ্টি করিতেছেন, কুন্দদন্তে আপন অধর
দংশন করিয়া টিপি২ হাসিতেছেন; রথবেগজনিত পবনে তাঁ-
হার অলকা সকল উড়িতেছে—দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদ বি-
জড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর
এক খানি চিত্র, সাগরিকা বেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রা-
লোকে বালতমাল তলে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতে-
ছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময় লতা বিল-
ম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া
গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মুছিতেছেন;
লতা পুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা ক-
রিয়া রহিয়াছে। আর এক খানি চিত্রে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দে-
খিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন
—অনসূয়া প্রিয়ম্বদা হাসিতেছে—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায়
মুখ তুলিতেছেন না— দুষ্মন্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন
না—যাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে, রণসজ্জিত
হইয়া, সিংহশাবক তুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার
নিকট যুদ্ধ যাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে
দিবেন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন।
অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া
অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটীতে তরবারির
অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা
কিছুই দেখিতেছেন না। চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন।

আর এক খানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ; তাহার পার্শে উচ্চ সৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া, বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদ খণ্ডবৎ, নানালঙ্কারভূষিত, প্রৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে, নানা রত্নাদি সহিত সুবর্ণরাশি স্তূপকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ উর্দ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলা পাশে সত্যভামা, সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী; উন্নতদেহ, পুষ্টকান্তি, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু২ ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন। এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখে বিমর্ষ, তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামীপ্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষন্মাত্র অধর প্রান্তে হাসি হাসিতেছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর স্থির, যেন কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার

উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারি দিকে বহু সংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকারি বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহু সংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত২ পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে সোণা রূপার তুলা?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষ মধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প২ বৃষ্টি হইয়াছিল। এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে২ বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে২ মুক্ত ছিল, সেই খানে২ বজ্রতুল্য শব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সাসী সকল ঝন২ শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর একটী দ্বার খোলাছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া, কত সুখের কথা বলিয়াছিলেন!

নগেন্দ্র ভূয়ো ভূয়ঃ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয়চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্র পুত্তলী সজীব দেখাইতেছিল। প্রতিচিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার

মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী একদিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? আর একদিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ি হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট২ বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যান মধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্য জন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি২ হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একবার গাড়ি লইয়া বহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোক লজ্জায় ম্রিয়মাণাহইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বল্গা ধারণ করিয়া গাড়ি অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীইত যত আপদের গোড়া।" নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন দেয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছিল—সূর্য্যমুখী তাহার অনুকরণ মানসে একটী লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিন দোলে, সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লা-

গিয়া, দেয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবিরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী একস্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৯১০ সম্বৎসরে

ইষ্ট দেবতা

স্বামীর স্থাপনা জন্য

এই মন্দির

তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী

কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পুরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃ২ লোপ হইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া২ পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে২ দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাসত্যাগ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারি দিকে কবাট তাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝা বাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন

তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত, এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি, সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্যা হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ছায়া।

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্য প্রাপ্তি হইল, তখনও শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার। ক্রমেং তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃ সঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিশ? বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিশ নহে। কোন মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনী? সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণবারি নগেন্দ্রের কপোল দেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নি-

শ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে, ধীরে২ রুদ্ধ নিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া বসিলেন।

এখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব্বদিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ হইয়াছিল—গৃহমধ্যেও আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প২ আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে২ দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন, এত কুন্দনন্দিনী নহে। তখন এমত আলো নাই যে মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আকার ভঙ্গী কতক২ উপলব্ধ হইল। আকারও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন। কাতরস্বরে, অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে বলিলেন,

"তুমি দেবতাই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী কি বলিল, কপাল দোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তীরবৎবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং দণ্ডায়মানা স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন, শরীর দুই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। কক্ষপার্শ্বে উদ্যান মধ্যে

বৃক্ষেং পক্ষিগণ কলরব করিতেছে শিরস্থ আলোকপন্থা হইতে বালসূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার ঊরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন্ আসিলে? আমি আজি সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত?" রমণী বলিল, "সেই পোড়ার মুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ার মুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া, মৃদুং আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না সূর্য্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন, "উঠ, উঠ! আমার জীবন সর্ব্বস্ব! মাটী ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উ-

ভগ্নির স্কন্ধে মস্তকন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

যথা সময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছিলেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম যে তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া, তোমার উদ্দেশে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। ইহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যে দিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনেই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রী

লোক থাকিত; তাহার একটি মরিয়া রহিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল, যে রুগ্ন, সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন, যে তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া, এই দিকে আসিয়াছ। তিনি অমনি ব্যস্ত হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কালি বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পঁহুছিয়াছেন। আমিও শুনিয়াছিলাম যে, তুমি দুই এক দিন মধ্যে বাটী আসিবে। সেই প্রত্যাশায় আমি পরশ্ব দিন এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্লেশ হয় না—পথ হাঁটিতে শিখিয়াছি। পরশ্ব তোমার আসা হয় নাই, শুনিয়া ফিরিয়া গেলাম, আবার কালি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পঁহুছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম, তখনও খিড়কি দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না। সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে, সিঁড়িতে উঠিলাম। মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি—কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই

তৃপ্ত। কপাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভাল বাসনা। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

সরলা এবং সর্পী।

যখন শয়নাগারে, সুখসাগরে ভাসিতে২ নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী এই প্রাণস্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, পূর্ব্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে, উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকাসুলভ রোদন নহে। মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছিল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এ রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, "কেন আমি স্বামিদর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম।" আরো ভাবিল যে, "এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?"

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের

তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয় বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারিবৎসর পূর্ব্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়নকালে, যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া, স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদ মধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষীপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকারমধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প২ হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে২ সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল, হীরার মুখানুরূপ। আরও দেখিল, মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীর ভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন,—

"কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত?"

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম, আর একবার আসিব। তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল! আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা, প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।" এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে।

কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীতভাব ধারণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সম্বাদই ইহার কারণ। পূর্ব্বপরুষ ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বরং হীরা, পূর্ব্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপট্য সহজেই বুঝিতে পারিত—কিন্তু কুন্দ অসামান্যা সরলা এবং আশুসন্তুষ্টা—সুতরাং হীরার এই নূতন প্রিয়কারিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্টা হয় নাই। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্ব্বমত, বিশ্বাসভাজনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রুক্ষভাষিণী ভিন্ন অবিশ্বাসভাজনী মনে করে নাই!

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকুরাণি, কাঁদিতেছ কেন?"

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, "একি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?"

কুন্দ বলিল, "কিছু না।"

এই বলিয়া আবার সম্বর্দ্ধিত বেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া, আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথা বার্ত্তা কহিলেন? আমরা দাসী, আমাদের কাছে তা বলিতে হয়।"

কুন্দ কহিল, "কোন কথাবার্ত্তা বলেন নাই।"

হীরা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?"

কুন্দ কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অসম্বরণীয় হইল।

হীরা মনে২ বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, "ছি মা! এতে কি কাঁদ্‌তে হয়? কত লোকের কত বড়২ দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল,—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্ব জন্য কাঁদিতেছ!"

"বড়২ দুঃখ" আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিন তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

"আত্ম হত্যা," এই মহা অমঙ্গলজনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর কানে দারুণ বাজিল। সে সিহরিয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রিকালে অনেক বার সে আত্ম হত্যার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নরাঙ্কিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, "তবে আমার দুঃখের কথা বলি শুন। আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে—কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মুনিবের কাছে, লুকালেই বা কি হইবে—স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।"

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তহার কানে সেই "আত্মহত্যা" শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কানে২ বলিতেছিল, "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে এ যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?

হীরা বলিতে লাগিল, "সে আমার স্বামী নহে; কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামীর অপেক্ষা ভাল বাসিতাম। সে আমাকে

ভাল বাসিত না। আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভাল বাসিত না। এবং আমার অপেক্ষা শত গুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভাল বাসিত।" ইহা বলিয়া হীরা নতনয়না কুন্দের প্রতি এক বার অতি তীব্র কোপকটাক্ষ করিল; পরে বলিতে লাগিল, "আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁসিলাম না, কিন্তু এক দিন আমাদের উভয়েরই দুর্ব্বুদ্ধি হইল।" এই রূপে আরম্ভ করিয়া, হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না; দেবেন্দ্রের নাম, কুন্দের নাম উভয়ই অব্যক্ত রহিল। এমত কোন কথা বলিল না যে, তদ্দ্বারা, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়ীর প্রণয়িনী, তাহা অনুভূত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম?"

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে?" হীরা হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখনই চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবা মাত্র মানুষ মরিয়া যায়।"

কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত, কহিল, "তার পর?"

হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পূরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটি হীরা মুনিব বাড়ীর প্রসাদ পুরস্কার এবং অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানেই রাখিত।

হীরা সেই বাক্সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল। বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনঃ বশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমত সময়, অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে, নগেন্দ্রের পুরিমধ্যে, মঙ্গলজনক শংখ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

কুন্দের কার্য্যতৎপরতা।

হীরা আসিয়া শংখধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটা বৃহৎ ঘরের ভিতর, গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক, এবং বালিকা সকলে মিলিয়া, কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহা কলরব করিতেছে। যাহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুগন্ধি তৈল নিসিক্ত করিয়া, কেশরঞ্জিনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্ব্বচন কহিতেছে। বালক বালিকারা নাচিতেছে; গায়িতেছে, এবং করতালী দিতেছে। সকলকে বেড়িয়া২ কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন, ও

হুলুধ্বনি দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন২ ঐ দিক ও দিক চাহিয়া, এক২বার নৃত্য করিতেছেন।

দেখিয়া হীরা বিস্মিত হইল। হীরা মণ্ডল মধ্যে গলা বাড়াইয়া উকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময় বিহ্বলা হইল। দেখিল যে, সূর্য্যমুখী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহ হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহার রুক্ষ কেশভার কুসুমসুবাসিত তৈলসিক্ত করিতেছে। কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে, কেহ বা আর্দ্র গাত্ররক্ষণীর দ্বারা তাঁহার গাত্র পরিমার্জ্জিত করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পূর্ব্বপরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল পরাইতেছে। সূর্য্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিছু লজ্জিতা, একটু২ সাপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার গণ্ডে স্নেহমুক্ত অশ্রু পড়িতেছে।

সূর্য্যমুখী মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আবার গৃহ মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে একজন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কেগা?"

কথা কৌশল্যার কানে গেল। কৌশল্যা কহিল "চেন না নেকি? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা, এত দিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজি দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে, এবং সকলের সঙ্গে আলাপ কুশল শেষ হইলে সূর্য্যমুখী কমলের কানে২ বলিলেন, "চল, তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই—বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"

কেবল কমল ও সূর্য্যমুখী কুন্দের সম্ভাষণে গেলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়-নিক্লিষ্ট বদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন। এবং অতি-ব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী রোদন করিতেছিলেন! নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে এক দিনেরও সুখ নাই—নতুবা আমি আবার সুখী হইবা মাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?"

নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকা বয়স হইতে মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"

নগেন্দ্র। সেকি?

সূ। তুমি তাহার কাছে থাক—আমি ডাক্তার বৈদ্য আনাইতেছি।

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকটে গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু হীনতেজঃ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

এতদিনে মুখ ফুটিল।

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া, ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদ্গদকণ্ঠে কহিলেন, "একি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথায় উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে, তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্প দিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতি পূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া, নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল—কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, "ছি? তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসি মুখ দেখিতে২ যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

সূর্য্যমুখীও এই রূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্ত্যকালে সবাই সমান।

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, " কেন তুমি এমন কাজ করিলে? তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ, বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায়, মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের বেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনেং স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখন ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজি তিনি বালিকা অবাকপটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহপ্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে, মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল।

কুন্দ আবার কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়া, অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্টনিশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা

বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখন মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিলনা আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুখাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া কুন্দ, পর্য্যঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধি দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া, ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগল মধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুইজনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমেং চৈতন্য-ভ্রষ্টা হইয়া, স্বামীচরণ মধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীনযৌবনে কুন্দ-নন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।

প্রথম রোদন সম্বরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবতি, তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক! আমি যেন এই রূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া, স্থানান্তরে লইয়াগেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধ সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

সমাপ্তি।

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্য হইয়াছিল।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। একবার মাত্র, বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তদুপরি, মদ্য সেবায় বিরতি না হওয়ায়, রোগ দুর্নিবার্য্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরেক মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারি দিন পূর্ব্বে সে গৃহমধ্যে রুগ্ন শয্যায় উত্থানশক্তি রহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে—এমত সময় তাহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?" ভৃত্যেরা কহিল যে, "এক জন পাগ্‌লী আপনাকে দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।" দেবেন্দ্র অনুমতি করিল, "আসুক।"

উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল যে, সে একজন অতি দীনভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না—কিন্তু অতিদীনা ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প, এবং পূর্ব্ব লাবণ্যের

চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা। তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থি বিশিষ্ট, এবং এত অল্পায়ত যে তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্দ্বারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ, ধূলিধূসরিত—কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।

ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকটে আসিয়া এরূপ তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য—এ কোন উন্মাদিনী।

উন্মাদিনী অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।"

দেবেন্দ্র তখন চিনিল, যে হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার এমন দশা কে করিল?"

হীরা রোষপ্রদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশিত করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। কিন্তু সম্বিতা হইয়া কহিল, "তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এদশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু এক দিন আমার খোষামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই ঘরে বসিয়া, আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপরে পা রাখিল) গায়িয়াছিলে—

'স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।' "

এইরূপ কথা মনে করিয়া দিয়া, উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, "যে দিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া নাতি মারিয়া তাড়াইলে,

সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয় দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম—আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খা[illegible]ইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম। তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার [illegible] বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেলা[illegible] হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছ-তলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আ-শীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।”

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গেল। হীরা তখন নাচিতে২ ঘরের বাহির হইয়া গায়িতে লাগিল,

> “স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
> দেহি পদপল্লবমুদারং।”

সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্পপূর্ব্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল, “পদপল্লব মুদারং” “পদপল্লবমুদারং।”

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষক ভীতচিত্তে শুনিয়াছিল যে, স্ত্রীলোকে গায়িতেছে’—

"স্মরগরল খণ্ডনং মমশিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

সমাপ্ত।